অদৃষ্টের খেলা

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দেড় টাকা

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রিন্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার
নিদর্শন স্বরূপ "অদৃষ্টের খেলা"
আপনার নামে উৎসর্গ করিলাম।

আরঙ্গাবাদ (গয়া)
বিজয়া দশমী। ১৩৩৬

ভবদীয়
শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

অদৃষ্টের খেলা

১

মেহেরপুর সবডিবিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে একটা চুরির অভিযোগের বিচার হইতেছিল। আসামী প্রতিবেশীর বাড়ী হইতে চাউল চুরি করিবার সময় ধৃত হইয়া থানায় প্রেরিত হইয়াছিল। পুলিশের কাছেই সে স্বীকার করিয়াছিল যে, কয়দিন তাহার ঘরে ধান বা চাল কিছুই ছিল না তাই শেষ রাত্রে সে চুরি করিতে আসিয়াছিল। কোর্টে আসিয়াও সে ঐ কথাই বজায় রাখিল। উপরন্তু বলিল, চাউল ধার করিতে তাহার কোন আপত্তি ছিল না কিন্তু ধার চাহিলে মিলিবে না বলিয়াই সে চুরিতে নামিয়াছিল।

বলা বাহুল্য এই সরল স্বীকারোক্তি তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। আসামীর মুখে এমন একটি ভাব ছিল. যাহাতে তাহাকে চুরির স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও সাধারণ চোর হইতে অনেকটা বিভিন্ন বলিয়া না ভাবিবার উপায় ছিল না। তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল একটু বেশী ধমক দিয়া লোকটাকে ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু পুলিশ দেখাইল যে, ইহার আগেও সে আর একবার একখানি কাপড় চুরি করিয়াছিল এবং ধরা পড়িয়া একমাস জেলও খাটিয়াছিল। সে বারেও সে বুঝাইবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিল যে, চুরিটা সে চুরি করিবে বলিয়া করে

নাই। রাস্তার ধারে একটি ছেলে শীতে কাঁপিতেছিল দেখিয়া একটা বেড়ার গা হইতে একখানি মোটা কাপড় তুলিয়া সে ছেলেটাকে দিয়াছিল। বেড়ার ধারেই যে গায়ের কাপড়ের মালিক চুপটি করিয়া লুকাইয়া বসিয়াছিল তাহা সে অত জানিত না। জানিলে কি সে এমনটা করিত?

বিচারকের মনে দয়া হইলেও আইনে তাঁহার হাত পা বাধা। চোরকে বিনা শাস্তিতে ছাড়িয়া দিবার উপায় ছিল না। হৃদয় যাহাকে মুক্তি দিতে চায়, আইনে তাহাকে বন্দী না করিয়া ছাড়িবে না।

বাঁচিবার একমাত্র উপায় ছিল, চুরি একেবারে অস্বীকার করিয়া অন্ত চোরের ঘাড়ে ইহার বোঝা চাপাইয়া দেওয়া। চুরি অন্ত লোকে করিয়া পলাইতেছিল এমন সময় গোলযোগ উঠায় সে ঘটনাস্থলে আসিয়া পৌঁছায়। চোর সেই সুযোগে তাহারই কাছে চাউলের বোঝা রাখিয়া পলায় এবং ভাগ্যচক্রে নির্দ্দোষ সে এই ভাবে চোর বলিয়া ধৃত হয়। উকিলের সাহায্যে এই রকম একটা গল্প বানাইয়া বলা এবং সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত করা পয়সা থাকিলে বিশেষ কঠিন হইত না। আরও সুবিধা ছিল, কেহ তাহাকে চুরি করিতে দেখে নাই। কিন্তু মার্জ্জনা পাইবার আশায় সে সব সত্য কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল আর উকিল দিবার তাহার সামর্থ্যও ছিল না। কাজেই তাহার শাস্তি অবশ্য প্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বিচারকের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখ দেখিয়া আসামী প্রমাদ গণিল। সে হাত জোড় করিয়া কহিল—"ধর্ম্মাবতার আমায় জেলে দেবেন না, দয়া করে বেত মেরে ছেড়ে দিন, আমি আর কখনও চুরি করব না।"

বিচারকের বিশ্বাস হইল যে, ইহার মনে অনুতাপের সঞ্চার হইয়াছে। এবার মার্জ্জনা করিলে হয় তো ইহার জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু বিচারক হইয়াও তাঁহার সে ক্ষমতা ছিল না। তাঁহাকে দণ্ডাজ্ঞা

দিতেই হইল। আপন ইচ্ছায় স্বীকার করিয়াছে, অপরাধীর মনে অনুতাপ হইয়াছে ইত্যাদি হেতু দেখাইয়াও এক মাস কারাদণ্ডাজ্ঞা দিতে হইল।

'আবার জেল!' বলিয়া আসামী কাঠগড়ায় বসিয়া পড়িল। প্রহরী আসিয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক কাঠগড়ার বাহিরে লইয়া আসিল।

একটু পরে বিচারালয়ের অনতিদূরে একটা কোলাহল উঠিল।

কিছু দূরে একটী গাছের তলায় আসামীর স্ত্রী বিচার ফলের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল। কাহার নিকট হইতে, ঠিক বলিতে পারা যায় না, এই মিথ্যা আশ্বাস সে পাইয়াছিল যে, তাহার স্বামী এ যাত্রা বাঁচিয়া যাইবে। স্বামীকে দূর হইতে প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় ফিরিতে দেখিয়া সে ছুটিয়া স্বামীর কাছে আসিতেই একটি প্রহরী ধাক্কা দিয়া তাহাকে সরাইয়া দিল ও তাহাকে জানাইয়া দিল যে, তাহার স্বামীর ছয়মাস জেল হইয়াছে। এক মাসকে ছয় মাস বলিয়া প্রহরীর কোন লাভ ছিল না। তবে বন্দীর স্ত্রীর দুঃখ এই সংবাদে কিছু বাড়িতে পারে এবং দণ্ডাদেশ দিবার না হউক, অন্ততঃ তাহা বাড়াইয়া বলিবার অধিকারটুকু তাহার আছে সুধু এই আনন্দ ও আত্ম-প্রসাদটুকু ইহাতে ছিল। প্রহরীর ধাক্কা ও স্বামীর ছয়মাস কারাবাসের সংবাদে বন্দীর স্ত্রী আর্ত্তস্বরে একবার চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। ইহা হইতেই কোলাহলের সৃষ্টি।

প্রহরীরা বন্দীকে জোর করিয়া লইয়া গেল। যাহার সঙ্গে বন্দীর স্ত্রী আদালতে আসিয়াছিল, সে এই অবসরে আসিয়া পড়িয়া বন্দীর স্ত্রীকে কিছু শান্ত করিয়া সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া গেল।

বিচারকের সেদিন আর বিচারকার্য্য ভাল লাগিতেছিল না। সমাজের কল্যাণের জন্য এই যে শাস্তি একজনকে তিনি দিয়াছিলেন, তাহার সে ফল আর একজন মাথা পাতিয়া লইল তাহার প্রতিকার কে করিবে?

এই নিরপরাধা নারীকে শাস্তি দিবার অধিকার তাঁহার তো কিছুই ছিলনা। এই সব চিন্তা এত দিনকার বিচারকার্য্যের পর আজ তাঁহাকে কাতর করিয়া তুলিল।

তিনি ধীরে বিচারকক্ষ ত্যাগ করিয়া আপনার বাস গৃহের দিকে ফিরিলেন।

২

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার ঠিক এক মাস একদিন পরে ডেপুটি সুরেশ চট্টোপাধ্যায় বিচারগৃহ ত্যাগ করিয়া যেমন বাহির হয়েছেন একটি বছর সাতেকের মেয়ে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিল—"বাবাকে তুমি বন্ধ করে রেখেছ কেন? বাবাকে ছেড়ে দাও।"

মেয়েটির করুণ স্বরে সুরেশবাবু চমকিত হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিলেন, মেয়েটির উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মলিন বসনে আরও যেন ফুটিয়া উঠিয়াছিল; সুন্দর বিষণ্ন মুখখানিতে মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতের সৌন্দর্য্য মাখা ছিল।

সঙ্গের চাপরাসীর পানে জিজ্ঞাসু ভাবে চাহিতেই সে বলিল—"হুজুর ওর বাপের চাল চুরি করার জন্য একমাস জেল হয়েছিল; কিন্তু দিন চারি পরেই লোকটা জেলে মারা গিয়াছে।"

সুরেশবাবুর অন্তরে কে যেন কশাঘাত করিল। তিনি মেয়েটির মাথায় স্নেহভরে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আর কে আছেন? মা আছেন?"

বালিকা বলিল, "বাবাকে তুমি আসতে দেওনি তাই মা রাগকরে

পুকুরের জলে লুকিয়েছে। আমি কত ডাক্‌লাম কিছুতেই উঠ্‌ল না। আমায় কাল থেকে কিছু খেতে দেয়নি।”

বলিয়া মেয়েটি ছোট দু’খানি হাত দিয়া মুখ চাপিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

জীবনে সুরেশবাবুকে এত বড় তিরস্কার কেহ করে নাই; আমরা যাহাকে সুশাসন বলি, ন্যায় বিচার বলিয়া গর্ব্ব করি, তাহার এমন পরিণাম কত স্থানেই হইতেছে। সুরেশবাবু মেয়েটিকে আরও কাছে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার মা কখন পুকুরে লুকিয়েছেন?”

মেয়েটি মুখ তুলিয়া চোখ মুছিয়া বলিল, “তখন বেলা হয়েছে, রান্নাও চড়ান হয়নি তখন।”

“আচ্ছা চল, আমি তোমার মাকে, ডেকে দিচ্ছি, তোমাদের বাড়ী কোন্ দিকে?” বলিয়া সুরেশবাবু ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

মেয়েটি বলিল, “আগে তুমি বাবাকে নিয়ে চল; নাহ’লে মা উঠ্‌বেন না।”

সুরেশবাবু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “আগে তোমাদের বাড়ী যাই, তার পর তোমার বাবাকে ডাকিয়ে আনাব।”

চাপরাসী বলিল, “তোর বাড়ী কোথা? সেখানে নিয়ে চল।”

মেয়েটি তখন পথ দেখিয়ে আগে আগে চলিল। সুরেশবাবু আফিসের পোষাকেই বালিকার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

চাপরাসী অপ্রসন্নমুখে ইহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল।

মিনিট পনের হাঁটিয়া সকলে একটি দরিদ্র কুটীরের কাছে পৌঁছিলেন। সেই কুটীরের এক প্রান্তে এক খানি পুরাতন অতি জীর্ণ দারিদ্র্যের প্রতিমূর্ত্তি গৃহে তাঁহারা আসিয়া উঠিলেন। দু’খানি মাত্র ঘর। এক খানির এক দিককার দেওয়াল নাই সেখানে খেজুর পাতা গাছের ডাল

ইত্যাদি দ্বারা নিজেদের হাতে বাঁধা বেড়া। অপর খানির ছাদের এক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অপর অংশ এমন ভাবে ঝুলিয়া আছে, যে কোন মুহূর্ত্তেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। যে ইট মাটি সুরকি ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল তাহা সেখানেই পড়িয়া স্থায়ী ইষ্টক ও সুরকির স্তূপে পরিণত হইয়াছে।

এই ঘরে কি করিয়া তিনটি প্রাণী এত দিন বাস করিয়া আসিতেছে ভাবিয়া সুরেশবাবু বিস্মিত হইলেন।

বালিকা সেখান হইতে তাহাদিগকে লইয়া সম্মুখকার পুকুরের দিকে গেল। পুকুরটির চারিধার লতা-গুল্ম এবং ছোট ছোট আগাছায় ভরিয়া গিয়াছিল। লতা পাতা পচিয়া পচিয়া জলের রঙ প্রায় সবুজে পরিণত হইয়াছিল। সহরের এক প্রান্তে যে এই প্রকারের পুষ্করিণী আছে তাহাও সুরেশবাবু জানিতেন না। তাঁহার আদেশে ২।৪ জন লোক আসিয়া উপস্থিত হইল ও জলে নামিয়া মৃত দেহ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় একজনের পায় কি ঠেকিল। সেখানে কোন রকমে ডুবজল। মাত্র ডুবদিয়া উঠিয়া লোকটী বলিল, "এইখানে একটা দেহ আছে, বড় ভারী।" তখন সকলে চেষ্টা করিয়া দেহটী পাড়ের উপর লইয়া আসিল, মৃতদেহ বালিকার মায়েরি। প্রাণ অনেকক্ষণ সে দেহ ত্যাগ করিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু মরণের জন্য কি ভীষণ আয়োজন! অর্দ্ধেক বালি ভরা দু'টা বড় বড় কলসী দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ঘাড়ের দুইদিকে ঝুলাইয়া তবে সে পুকুরে নামিয়াছিল। পাছে শেষ মুহূর্ত্তে মরণের ভয়ে কলসী দু'টি ফেলিয়া দেয়, সেই ভয়ে দড়িটা গলায় ফাঁসের মত আটকাইয়া দুর্ণিবার মরণাকাঙ্ক্ষায় সে ডুবিয়াছিল। তাহার আয়োজন ব্যর্থ হয় নাই। বোধ হয় কয়েক মিনিটেই তাহার আশা পূর্ণ হইয়াছিল।

মায়ের দেহ দেখিয়ামাত্র বালিকা ছুটিয়া আসিয়া 'মা ওমা' বলিয়া মায়ের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মায়ের হাত ধরিয়া মাথা নাড়িয়া তাহাকে উঠাইবার নানাবিধ চেষ্টা করিয়া মায়ের বুকে মাথাটি লুটাইয়া দিল।

বালিকা সংজ্ঞা হারাইয়াছিল। সুরেশবাবুর আদেশে বালিকাকে নিকটবর্ত্তী একজনের ঘরের বারন্দায় লইয়া গিয়া তাহাকে সুস্থ করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। একটু পরে চক্ষু মেলিয়া চাহিতেই বালিকাকে একটু গরম দুধ খাওয়াইয়া দেওয়া হইল, গরম দুধ খাইয়া সে কিছু সুস্থ হইল।

এ দিকে সুরেশবাবু মৃতদেহ সংকারের ভার ও কয়েকটী টাকা একজনের হাতে দিলেন। কয়েকজন মিলিয়া মৃতদেহ সেখান হইতে উঠাইয়া লইয়া গেল।

সুরেশবাবু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন একমাস পরে কাল এই মৃতা নারীর স্বামীর ফিরিবার কথা ছিল। কালই সে সংবাদ পাইয়াছিল যে, জেলে তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। রাত্রে দুই একজন তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু সে কাহাকেও দুয়ার খুলিয়া দেয় নাই। পাশের বাড়ীর লোকটী একবার শুনিয়াছিল, মেয়েটী বলিতেছিল—ওমা উঠ না, মা বড্ড খিদে পেয়েছে ওমন ধারা করে বসে আছ কেন? কথা কওনা মা!' তার পর আর কিছুই সে শুনিতে পায় নাই।

মৃতদেহ স্থানান্তরিত হইয়া গেলে সুরেশবাবু মেয়েটিকে কাছে আনাইলেন। সে আসিয়াই মায়ের দেহ যেখানে ছিল সেই দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া বলিল, "আমি মার কাছে যাব।"

সুরেশবাবু সস্নেহে মেয়েটির চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "চুপ কর; তোমার মা স্বর্গে গেছেন।"

মেয়েটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, “আমি তা হলে কোর কাছে থাক্‌ব ?” সুরেশবাবু একটু খানির জন্য ভাবিলেন, তিনি এখন কি করিবেন। এই বালিকার পিতামাতার জন্য তিনিই এক প্রকার দায়ী। তিনিই ইহার পিতাকে জেলে না দিলে হয় ‘তো’ তাহার মৃত্যু ঘটিত না এবং ইহার মাতাকেও আত্মহত্যা করিতে হইত না। ইহার আত্মীয় কেহ নাই যাহার কাছে ইহার থাকিবার ব্যবস্থা করিবেন। স্থির করিলেন, বালিকা যখন তাঁহারই জন্য নিরাশ্রয়, তিনি ইহাকে আশ্রয় দিবেন।

একখানি গাড়ী ডাকান হইল, মেয়েটির হাত ধরিয়া সুরেশবাবু গাড়ীতে উঠিলেন। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় মিলিল।



মেয়েটিকে আশ্রয় দিবার পর এক সপ্তাহ অতীত হইয়াছে। সন্ধ্যার পর সুরেশবাবু তাঁহার গৃহিণী সুশীলাসুন্দরীর সহিত কথা কহিতেছিলেন।

সুরেশবাবু। ইন্দুর মন একটু বসেছে তো ?

সুশীলা। এত শীগ্‌গির কি ক’রে বস্‌বে বল! এখনো তার ভাল ক’রে ভয় ভাঙ্গেনি। দেখনি, কোর্টের পোষাক প’রে তুমি বাসায় এলেই ওর মুখখানি শুকিয়ে যায় ?

সুরেশ। তাই নাকি ? তা ওরও বড় দোষ নেই। আমাকে কোর্টের পোষাকে দেখ্‌লে বোধ হয় ওর বাপের জেলের কথা মনে পড়ে। যতই স্নেহের কথা বলি না কেন, ও ভাবটা ওর মন থেকে কিছুতে যাচ্ছে না।

সুশীলা। তোমার ব্যবহারে যে একেবারে ফল হয়নি তা নয়। তুমি

যখন কোর্টের পোষাক ছেড়ে ধুতি পর, তখন তার চোখ থেকে ভয়ের ভাবটা কেটে যায়। তোমার কথায় তার মন নরম হ'য়ে আসে।

সুরেশ। দেখ, ওকে তোমার ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশী যত্ন কোরো। একরকম ধর্‌তে গেলে আমার জন্যই ও বাপমাকে হারিয়েছে।

সুশীলা। এ কথা তোমার মনে করা উচিত নয়। তুমি তো রাগ ক'রে বা নিজের স্বার্থের জন্য ওকে শাস্তি দাওনি। আইনে যা বলে, যা না দিলে উপায় নেই, তাই দিয়েছ। এর জন্য মন খারাপ কোরো না। ইন্দুর যত্নের জন্য তুমি ভেব না। আমি ওর মন বসাব। হাজার হোক বড় অভাবের ঘর থেকে এসেছে কি না, তাই একটুখানি ডাঙ্গার মাছের মতো হয়েছে। কিছুদিন আমাকে সময় দাও সব ঠিক ক'রে নেব। আমাকে কি তোমার বিশ্বাস হয় না?

সুরেশ। বিশ্বাসের কথা আর নূতন ক'রে তুল্‌ছো কেন? তোমাকে অবিশ্বাস কর্‌বার উপায় যে রাখিনি। হাস্‌ছ যে?

সুশীলা। একটা পুরাণো কথা মনে হ'ল তাই।

সুরেশ। কি কথা?

সুশীলা। অনেক কাল হয়ে গেছে, যাক্ সে কথা।

সুরেশ। তা হ'কগে। বলই না!

সুশীলা। তখন সবে যতীন হ'য়েছে। কোথা থেকে একটা আজগুবি খবর শুনে এসে দিনকতক আমাকে কি জ্বালাতনই কত্তে। কে একজন বড়লোক বাড়ী থেকে বেরুবার সময় তার স্ত্রীকে ঘরের মধ্যে চাবি বন্ধ ক'রে যেত। সে সুন্দরী ছিল এই তার অপরাধ। তুমি দিনকতক তাই চালাকি আরম্ভ করেছিলে—হ্যা গো জানালার দিকে এতক্ষণ তাকিয়েছিলে কেন? কে একজন লোক রাস্তার ওধার থেকে হাঁ করে যেন গিল্‌ছিলো তোমার মনে পড়ে না?

সুরেশ। খুব পড়ে। আর এই ঠাট্টা করার ফলটুকুও তোমার মনে আছে ?

সুশীলা। তা আবার নেই। আমিই তো তোমাকে সে কথা বলেছিলাম। আমার কিন্তু চিরদিন মনে থাক্‌বে কি উদ্বেগের সঙ্গেই মা বলেছিলেন—তোমাকে বুঝি আজকাল অবিশ্বাস কত্তে সুরু করেছে! এ দুর্ব্বুদ্ধি তার কতদিন হয়েছে ? অবিশ্বাস করেন না বল্‌তে গিয়ে মার কাছে উল্‌টো বকুনি খেলাম। তখন লজ্জার মাথা খেয়ে সব বুঝিয়ে বল্‌লাম। সমস্ত মুখখানি তাঁর হাসিতে ভরে এল। এতও জান বাছা তোমরা—ব'লে মা সেখান থেকে চলে গেলেন। এই সব কথা বলে তবে তোমার ঠাট্টা বন্ধ করি।

সুরেশ। কত কাল হ'য়ে গেছে সে সব কথা। এখনও মনে হ'লে ভাবি বুঝি যৌবন ফিরে এল।

সুশীলা। তোমার ওই ফিরে এল কথাটি আমি কখনও মান্‌ব না। মনের যৌবন তোমার কোন দিন যাবে না। আজকালকার অকালবৃদ্ধ যুবকদের ও তোমার কথা ভাব দেখি! প্রায় একেবারে নিরক্ষর হয়ে তোমার কাছে এসেছিলাম, মনে আছে ত ? তোমার চিরনবীন মন তাই না আমাকে কোন রকমে চল্‌বার মতো করেছ!

সুরেশ। আমার চিরযৌবন ও নবীনতার প্রসঙ্গ এখন থাক্‌। আচ্ছা বাপমার জন্য ইন্দু কাঁদে ?

সুশীলা। তা আর কাঁদবে না ? এই নৈশ্র্‌ বাপমাকে হারিয়েছে এখনও এক হপ্তা পেরোয়নি। যত্ন ক'রে হাতে খাবার দিতে গেছি, দেখি—তার চোখ দু'টি জলে ভরে এসেছে। রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এক একবার মা মা করে কেঁদে ওঠে। সে দিন তুমি মফঃস্বলে গিয়েছিলে, শেষ রাতে উঠে দেখি—ইন্দু তার বিছানায় নেই। খুঁজতে গিয়ে দেখি

ঘরের কোণটিতে বসে মুখ গুঁজে কাঁদছে। আমি কাছে যেতে বল্লে—আমি মার কাছে যাব। মার জন্য আমার মন কেমন কর্ছে। এখনো দিনকতক এ রকম যাবে। তারপর আমাদের বাড়ীই নিজের বাড়ী বলে মনে কর্বে। হ্যাঁগা সে কথার কি হ'ল? মেয়েটির বাপমার বংশের পরিচয় তো নেয়া দরকার। যখন এর ভার নিয়েছ বিয়ে তো দিতেই হবে। হঠাৎ যদি বদ্‌লি হয়ে যাও তো শেষটা ভাল করে কিছু জান্‌তেই পার্‌বে না।

সুরেশ। আজকে জান্‌তে পার্‌ব বোধ হয়। ওই পাড়াতেই ওদেরই একজন আত্মীয় আছেন। তাঁরই আজ আস্‌বার কথা আছে। সকালের দিকেই আস্‌বেন। এখন উঠি, অনেক কাজ আছে।

সুরেশবাবু উঠিয়া বাহিরে আফিসে গিয়া সরকারি ডাক ও সাধারণ পত্রাদিতে মনোনিবেশ করিলেন।

আজ প্রভাতে যৌবনের—জীবনের—বসন্তপ্রভাতের—কথা মনে পড়ায় সুশীলাসুন্দরীর স্মৃতি প্রজাপতি রঙিন পাখা মেলিয়া কুড়ি বৎসর আগেকার পৃথিবীর বুকে ফিরিয়া গিয়াছিল। বিবাহের প্রথম দিন হইতে স্বামীর একনিষ্ঠ প্রেম লাভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত সেই প্রাণপূর্ণ প্রেমের শিখা অখণ্ড রাখিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। কি অবিরল অনুরাগ ও অসীম অধ্যবসায় লইয়া স্বামী তাঁহাকে শিক্ষার দ্বারা নিজের মনের মতো করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন—তাহা ভাবিতেও তাঁহার নারী-হৃদয় আজ নবীন হইয়া উঠে! দু'জনেরই প্রেম চিরদিন সমান তেজে দু'জনেরই হৃদয় দীপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল; একটি দিনের জন্যও তাহা ম্লান হইবার অবসর পায় নাই;—তাই না হৃদয়ে বাহিরে সর্ব্বত্র আজ শান্তি বিরাজিত। তাই না—তাঁহাদের পুত্র-কন্যাগুলি সব ফুলের মতো সুন্দর দেহ ও মন লইয়া জন্মিয়াছে। পিতামাতার প্রেম যে পুত্র কন্যাদের মুখে গোলাপের গন্ধ ও

বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা উহাদের মুখের পানে একবার চাহিলেই বুঝা যাইবে!

সুশীলাসুন্দরী এই সব ভাবনায় তন্ময় হইয়া আসিতেছেন এমন সময় একটি সুন্দরী বালিকা—রবীন্দ্রনাথের "শিশু"খানি হাতে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—'নদী' কবিতাটির এইখানটি ভাল করে বুঝিয়ে দাওনা মা!"

"কোনখানটা দেখি?" সুশীলাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন।

বালিকা বইখানি মায়ের সম্মুখে খুলিয়া পড়িল;—

সেই নীল আকাশের পায়ে,
সেথা কোমল মেঘের গায়ে,
সেথা শাদা বরফের বুকে
নদী ঘুমায় স্বপন-সুখে।
কবে মুখে তার রোদ লেগে
নদী আপনি উঠিল জেগে;
কবে একদা রোদের বেলা
তাহার মনে পড়ে গেল খেলা,
সেথা একা ছিল দিন রাতি,
কেহই ছিলনা খেলার সাথী;
সেথা কথা নাহি কারো ঘরে,
সেথা 'গান কেহ নাহি করে।
তাই ঝুরু ঝুরু ঝিরি ঝিরি
নদী বাহিরিল ধীরি ধীরি।
মনে ভাবিল যা আছে ভবে
সবই দেখিয়া লইতে হবে!

সুশীলাসুন্দরী বইখানি হাতে লইয়া কল্পনা ও সত্যের একাগ্র সমাবেশ নদীর এই বিচিত্র জন্মকাহিণী অতি সুন্দর ভাষায় বালিকাকে বুঝাইয়া দিলেন। কল্পনা-চক্ষে পাহাড়ের শিরে সেই শব্দহীন জীবশূন্য বরফের দেশে যেখানে মাতৃঅঙ্কে শিশুর মতো নদী নিদ্রিত মোহাচ্ছন্ন হইয়া আছে। হঠাৎ একদিন সূর্য্যকর আসিয়া ডাকিল—ওগো ওঠ, আর কতকাল ঘুমাইবে ?

নদী চক্ষু মেলিয়া চাহিল। বরফশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল। দেশ বিদেশের নূতন আলো, নূতন গান, নবীন প্রাণ দেখিবার জন্য বাহির হইল।

সপ্তদশবর্ষীয়া স্বল্পাবগুণ্ঠিতা সুন্দরী যুবতী দুয়ারের কাছে আসিতে সুশীলা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বৌমা ?

যুবতী নিম্নস্বরে বলিলেন—কি রান্না হবে একবার ব'লে দেবেন মা ?

"দিচ্চি চল মা" বলিয়া সুশীলা সুন্দরী সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া রান্না ঘরের দিকে চলিলেন।

সুরেশবাবুর বয়স পঞ্চাশ বৎসর। তাঁহাদের স্ত্রীর বয়সও প্রায় চল্লিশ হইয়াছে। তাঁহার আদি নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে ; কিন্তু কলিকাতাতেই ইঁহার পিতার সময় হইতেই বসতি। ইঁহারা দুই ভাই ; ইনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ছোট ভাই মুন্সেফ। সুরেশবাবুর দুই পুত্র ও পাঁচ কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র ফণীন্দ্র এম-এ, বি-এল, পাশ করিয়া কলিকাতায় হাইকোর্টে—পিতার এক বন্ধুর জুনিয়র হইয়া বাহির হইতেছেন। কনিষ্ঠ মণীন্দ্র মেছের পুরেরই স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেছে।

এই চট্টোপাধ্যায় পরিবার শিক্ষাকে জীবনের একটি প্রধান আনন্দের উপাদান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সুশীলাসুন্দরীর যখন বিবাহ হয়—তখন তিনি যৎসামান্য বাংলা শিখিয়া

আসিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু স্বামীর ইচ্ছা ও চেষ্টায় তাঁহাকে খুব ভাল বাংলা, মোটামুটি ইংরাজী ও গান শিখিতে হইয়াছিল। সুরেশবাবু নিজে খুব ভাল গাহিতে পারিতেন। স্ত্রীকেও তিনি অতি যত্নে সুন্দর গাহিতে শিখাইয়াছিলেন। সুশীলার মধুর কণ্ঠের সুন্দর গান শুনিয়া তিনি বলিয়াছেন—সামান্য চেষ্টায় তোমার কণ্ঠে কেমন সুন্দর সুরের সৃষ্টি হ'ল বল দেখি! অবহেলায় এটা যদি হারাতুম কত বড় একটা অন্যায় হ'ত ভাব ত! যখন ক্লান্ত বা বিমর্ষ হ'য়ে আস্‌ব তুমি আমাকে কতখানি আনন্দ দিতে পারবে ভেবে দেখ। আর দেখ্‌বে আমাদের ছেলেমেয়েদেরও গানের দিকে কেমন একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ হবে। তারা অল্পায়াসে শিখ্‌বেও।

মেয়ে মানুষের গানে কি দরকার?—কেহ বলিলে তিনি বলিতেন—সুকণ্ঠের দরকার কিসে নয় বল? একটা স্তব পড়্‌বে তাতেও সুর আছে। ভগবান্ কণ্ঠে কণ্ঠে সে সুর দিয়েছেন তার চর্চ্চা সবারই দরকার। আর মজা দেখ; কাহারও বাড়ীর বাহিরের ঘরে গিয়ে বস, বাড়ীর ভিতর থেকে উচ্চ কণ্ঠে কথাবার্ত্তা খুব শুনতে পাবে। এমন কি অজ্ঞাতভাবে যদি থাক্‌তে পার ঝগড়া পর্য্যন্ত বাদ যাবে না। এসব আমরা দেখা বলে মনে করিনে আর এর জন্য লজ্জিতও হইনে। কিন্তু গোপনে গীত গানের একটা ছত্র যদি আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছায়। তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে!

এই দুইটি পুরুষ ও নারী নিজেকে ভাল না বাসিয়া একজন অপরকে সত্য সত্যই ভালবাসিত তাই তাঁহাদের গৃহে শান্তি ও চিত্ত প্রেম চিরদিন বিরাজ করিতেছিল।

৪

ইন্দুর বাপের আত্মীয়টি ইন্দুর বাপ সম্বন্ধে বড় বেশী কিছু বলিতে পারিলেন না। কেবল বলিলেন, তাহার নাম সঞ্জীবচন্দ্র রায়, জাতি ব্রাহ্মণ, দূর সম্পর্কে ইহাঁর ভাগিনেয় এই পর্য্যন্ত! তাঁহার নিকট আরও এইটুকু জানা গেল—সঞ্জীব লোকটি একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। ইদানীং বড় একটা কাহারও সহিত কথা কহিত না। আগে এখানেই ছোট খাট কাজকর্ম্ম করিত। তারপর উহার মেয়েটি জন্মানোর পর চুয়াডাঙ্গায় কি একটা চাকরি লইয়া গিয়াছিল। গত ছয়মাস হইতে আবার এখানে আসিয়াই স্থির হইয়া বসিয়াছিল। কেহ বলিত চুয়াডাঙ্গায় চাকুরি ছাড়িয়া দিয়াছিল; কাহারও বিশ্বাস কাজে জবাব হইয়া গিয়াছিল!

আত্মীয়টি এই পরিচয়টুকুর সঙ্গে একটা বড় ষ্টীলট্রাঙ্ক দিয়া গেলেন। ট্রাঙ্কটি পুরাতন হইলেও খুব সুদৃশ্য, বৃহৎ ও মূল্যবান্; চাবি তাঁহার কাছে ছিল না সেজন্য ভিতরে কি আছে তিনি জানেন না।

সন্ধ্যার পর সুরেশবাবু ট্রাঙ্ক খুলিয়া দেখিলেন, জিনিস পত্র কিছু নাই বলিলেই হয়! কেবল কতকগুলি পুরাতন চিঠি ও দুইখানি সঞ্জীবের হাতের লেখা খাতা—ডায়েরী গোছের।

যে মানুষ ডায়েরী রাখে, ভদ্রবংশে জন্মলাভ করিয়াছে, কেমন করিয়া তাহার প্রতিবাসীর গৃহ হইতে চাউল চুরি করিতে প্রবৃত্তি হইল ভাবিয়া সুরেশবাবু বিস্মিত হইলেন। ইন্দুর বাপের পরিচয় ইহা হইতে হয়ত কিছু জানিতে পারিবেন ভাবিয়া তিনি প্রথম ভাগ চিহ্নিত ডায়েরীখানি খুলিয়া সুশীলাসুন্দরীকে শুনাইয়া শুনাইয়া পড়িতে লাগিলেন। সমগ্র ডায়েরী

উদ্ধৃত না করিয়া পরিচয়ের জন্য যেটুকু দরকার তারিখ বাদ দিয়া আমরা তাহারই উল্লেখ করিব।

৩।১। কাল প্রোমোশন হইয়া গেল! এবার তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিলাম। তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় আমাদের ক্লাশে ইংরাজী পড়াইবেন। ডায়েরী রাখার উপকারিতা বুঝাইয়া তিনি আমাদের সকলকে ডায়েরী রাখিতে বলিলেন। তাই আজ হইতে ডায়েরী রাখা আরম্ভ করিলাম। ফার্ষ্ট হইয়াছি বলিয়া কাল একটু আনন্দ হইয়াছিল। কিন্তু এ সংবাদে মায়ের চোখে জল আসিল কেন বুঝিলাম না। বোধ হয় বাবা নিরুদ্দেশ—সে জন্যই মায়ের এ দুঃখ হইয়াছে।

১০।১। সুশীল মিছামিছি আমার সহিত বিবাদ করিয়া বিনাদোষে দুর্ব্বাক্য বলিল। গেল বৎসর সে ফার্ষ্ট হইয়াছিল এবার আমি হইয়াছি—এই আমার অপরাধ।

এই ফার্ষ্ট হইবার কথা উল্লেখ করিয়াই সুশীল বলিল—বাবা বলিয়াছেন জারজ ছেলেদের বুদ্ধি একটু বেশী হয়ে থাকে। সঞ্জীব ফার্ষ্ট হয়েছে তাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নেই।

২০।১—এসব দুর্ব্বাক্য আর সহ্য করিতে পারি না। কাহার উপর রাগ করিব? বাবার উপর? তাঁহাকে তো কখন দেখি নাই। মায়ের উপর? তাঁহার কি দোষ? বাবা যদি সমস্ত কর্ত্তব্য ঝাড়িয়া ফেলিয়া নিরুদ্দেশ হন্, মা কি করিতে পারেন? মাকে আসিয়া আজ বলিলাম—মা তুমি কেন শ্বশুরবাড়ী গিয়া থাক না?

মা উত্তর না দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম—মা, চল, আমাদের যেখানে বাড়ী সেখানেই গিয়া আমরা থাকিব। লোকে তোমার বড় নিন্দা করে; আমি তাহা সহ্য করিতে পারি না।

মা বলিলেন—সেখানে যাইবার উপায় নাই।

আমি কহিলাম—তাঁহারা টাকা পাঠান্ আর গেলে দু'মুঠা খাইতে দিবেন না ?

মা উত্তর দিলেন—টাকা তোমার বাপের এক বন্ধুর হাত দিয়া আসে।

আমি আর সহিতে পারিলাম না। রাগিয়া বলিলাম—এসব কি কথা মা ? বাবা নিরুদ্দেশ। দাদামহাশয়ের কাছে যাইবার উপায় নাই। বাবার বন্ধু টাকা পাঠান। এ সব কি কথা আমাকে বুঝাইতেছ ? তবে কি এরা যে সব কথা বলে—

মা আমার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কথা শেষ করিতে দিলেন না। রাগ ও অভিমানে আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। আমার চোখ মুছাইয়া মা বলিলেন—ছি বাবা, ও কথা আর মুখে আন্‌তে নেই। মাকে ও কথা বলে !

ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে মাকে বলিলাম—তুমি কেন সব কথা আমাকে বল্‌ছ না !

মার নিজের চক্ষেও জল আসিয়াছিল। চক্ষু মুছিয়া তিনি বলিলেন—তোমার বাবা নিরুদ্দেশ নন্। আমাকে তিনি গোপনে বিবাহ করিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন আমার শ্বশুরকে বিবাহের কথা পরে বলিবেন। ইহার কিছুকাল পরে তোমার বাবা পুনরায় বিবাহ করেন। আমার সহিত যে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল একথা আর তাঁহার বলিবার সুবিধা হয় নাই। তা বলিয়া আমাকে একেবারে ভোলেন নাই। বৎসরে ৩।৪ বার আমার বাপের বাড়ী আসিতেন। গোপনে আসিতেন, গোপনেই চলিয়া যাইতেন। হঠাৎ এই সম্বন্ধে একটা কানাঘুসা আমার শ্বশুরের কানে পৌঁছায়। তখন তোমার বয়স দেড় বৎসর। এক রাত্রে হঠাৎ তোমার বাবা আসিয়া বলিলেন, তিনি বড় বিপন্ন। এই বিবাহের একটা

সন্দেহ তাঁহার বাপের মনে হইয়াছে। তিনি এখানেও সন্ধানের জন্য লোক পাঠাইতে পারেন। এই বিবাহ প্রকাশ পাইলে পিতার সমস্ত সম্পত্তি হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইবে; লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিবেন না। পরদিনই তিনি নিজে ব্যবস্থা করিয়া আমার এক দূর-সম্পর্কের মামার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গেলেন। তাহার পর তাঁহাকে আর কখন দেখি নাই। সুধু মাস শেষ হইলে এক অপরিচিত লোকের প্রেরিত ত্রিশটী করিয়া টাকা মণিঅর্ডারে আসে মাত্র।

মায়ের চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। আমার চক্ষে জল আসিল না। পিতার উপর এক দারুণ ক্রোধ আমার মনে পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। তাঁহার দোষেই তাঁহার মিথ্যা কথার জন্যই মাকে আমার এমন হীন অবস্থায় থাকিতে হয়; আমাকে লোকের কাছে দুর্ব্বাক্য শুনিতে হয়।

৩০।১—লোকে বলাবলি করে আমার মা নাকি আমার পিতার বিবাহিতা স্ত্রী নহেন। সুধু টাকা নিয়মিত আসে; তিনি কখন আসেন না—তাই বোধ হয় এই কথা উঠিয়াছে। শিক্ষকেরা বলেন, পুস্তকেও লেখা আছে—পিতা দেবতাতুল্য; তাঁহাকে ভক্তি করিতে হয়। কিন্তু বলিতে নিজের উপরেই ঘৃণা হয়—পিতার কথা উঠিলেই দারুণ লজ্জায় আমার মন সংকুচিত হয়। আমার মাকে বিবাহ করিয়া সে বিবাহ অস্বীকার করিয়া পুনর্ব্বার যিনি বিবাহ করিয়া নিশ্চিন্ত সুখে আছেন, তাঁহাকে কি করিয়া ভালবাসিব বা ভক্তি করিব!

মণিঅর্ডারে যখন টাকা আসে আমার মনে হয় টাকাটা ফিরাইয়া দিই। টাকায় যেন আরও অপমান বাড়াইয়া তুলে। ইচ্ছা হয় স্কুল ছাড়িয়া দিয়া কাহারও কাছে সামান্য চাকরের কাজ লইয়া মাকে খাওয়াইব কখনও টাকা লইব না। মাকে একদিন এ সংকল্পের কথা বলিলাম। মা

বলিলেন—পাগল ছেলে, তা কি করিতে আছে! তুই লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইবি—এ যে আমার বড় আশ্বাস।

—জানুয়ারী। এক বৎসর কাটিয়া গেল। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিলাম। এবার সুশীল থার্ড হইয়াছে, আমি সেকেণ্ড হইয়াছি। ইচ্ছা করিয়াই ফার্ষ্ট হইবার লোভ এবার ত্যাগ করিয়াছি। দুইখানি অঙ্ক সমস্ত ঠিক করিয়া উত্তরের বেলা ইচ্ছা করিয়া ভুল করিয়া দিয়াছি। কি করিব। নহিলে সে বছরের মত এবারও দুর্ব্বাক্য সহিতে হইত। কিন্তু জানা জিনিস, ইচ্ছা করিয়া না লিখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া, আর ইচ্ছা করিয়া অঙ্কের উত্তর ভুল করা কি শক্ত তাহা আর কি বলিব! কাগজ রাখিয়া চলিয়া আসিবার সময়ে চোখে জল আসিয়াছিল। কেহ দেখিবার আগেই তাহা মুছিয়া ফেলিলাম। তা হউক, ফার্ষ্ট না হয় নাই হইয়াছি, কিন্তু দুর্ব্বাক্য হইতেও বাঁচিয়াছি। এবার হইতে পড়িবার বই কম করিয়া পড়িব। তাহা হইলে জানিয়া উত্তর না করার কষ্ট হইতে বাঁচিয়া যাইব।

—ফেব্রুয়ারী—। আজ সকালে মা একটি প্রকাণ্ড বিবাদ ঘাড়ে করিয়া আনিয়াছেন। এই পাড়াতেই এক বিধবা ব্রাহ্মণী ছিলেন; মা তাঁহাকে সই বলিতেন, আমি তাঁহাকে সইমা বলিয়া ডাকিতাম। এই একটি মাত্র প্রাণীর সহিত মা প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতেন। উভয়ে উভয়কে সত্যসত্যই ভালবাসিতেন। গত পরশ্ব তিনি কলেরায় আক্রান্ত হন্। কাল রাতে মারা যান্। মা কাল রাতে সেখানেই ছিলেন। ইহাঁদের অবস্থা আমাদের চেয়েও শোচনীয়। পরের ভাঙ্গা বাড়ীতে থাকিতেন। মুড়ি ভাজিয়া, চিঁড়া কুটিয়া, পৈতা তুলিয়া কোন রকমে আপনার ও একটি সাত বছরের মেয়ের অন্নের সংস্থান করিতেন।

সকালে মা সইমার সৎকারের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার মেয়েটিকে সঙ্গে

লইয়া আসিয়াছেন। আমাকে বলিলেন, গিরিবালা আজ হইতে এখানেই থাকিবে; আমি সইয়ের মৃত্যুশয্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। মায়ের কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইল। সেদিন ক্লাসে শুনিয়াছিলাম one blind man leading another (এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে); এও তাই, মেয়েটি সম্মুখে বসিয়া কাঁদিতেছিল বলিয়া আর কিছু বলিলাম না।

রাত্রে মেয়েটি ঘুমাইলে মা আর যাহা বলিলেন, তাহা শুনিয়া তো আমার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। মা আরও একটি সাধু কাজ করিয়া আসিয়াছেন। এই গিরিবালার সহিত আমার বিবাহ দিতেও প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অশৌচ কাটিয়া গেলেই সাম্‌নের ফাল্‌গুনেই বিবাহ দিবেন বলিলেন। এত তাড়াতাড়ির কারণ—শেষে যদি কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় তখন মেয়েটির কি গতি হইবে।

মার উপরে বড়ই রাগ হইল। আপনি শুতে ঠাঁই পায়না শঙ্করাকে ডাকে—যা তাই করিয়াছেন। মাকে বলিলাম তিনি জানিতেন যে, আমার বিবাহ হওয়া অসম্ভব ছিল। একে গরীব, তায় লোকনিন্দা একটা আছে, এ অবস্থায় কেহই মেয়ে দিতে রাজী হইত না। সে জন্য ফাঁকি দিয়া মা এ ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি যে কিছুতেই এ বিবাহ করিব না তাহা মাকে বিশেষ করিয়া জানাইলাম।

মার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বলিলেন স্বামীর অবজ্ঞা জীবন ভরিয়া বহিতে হইয়াছে। পুত্রের কাছে তাঁহার প্রার্থনা, সে যেন তাঁহাকে অবহেলা না করে।

মা একেবারে বালিকার মত ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি অবাক্। এই কথায় মায়ের এত কষ্ট হইল কেন? বোধ হয় মা আমার বেশী আশা করিয়াছিলেন; তাই আমার অস্বীকারে এত ব্যথা পাইয়াছেন।

মায়ের অবাধ্য হইব না বলিয়া মাকে শান্ত করিলাম।

—ফাল্‌গুন মাস—। মা বলিলেন ১৬ই ফাল্‌গুন ভাল দিন আছে; ঐ দিন আমাদের বিবাহ হইবে। মাকে অনুরোধ করিলাম—আর ২।৪ মাস যাক না মা; আমরা কেহই তো পলাইব না! মা বলিলেন, সইয়ের মৃত্যুশয্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এমাসে বিবাহ না দিলে যে পাপ হইবে। আমি আর কিছু বলিলাম না।

১৬ই ফাল্‌গুন।—বিবাহ হইয়া গেল। বরযাত্র নাই, বাদ্য নাই, কোন বালাই নাই! মাকে বলিলাম—পুরোহিতেরই বা দরকার কি মা? মা বলিলেন বিবাহ লইয়া ঠাট্টা করিতে নাই।

চৈত্রমাস।—গিরিবালা আমার স্ত্রী হইয়াছে। আর যা হউক মা একটু প্রফুল্লিত হইয়াছেন এই টুকুই লাভ। গিরিবালা ১০ বছরের মেয়ে হইলেও মাকে খুব সাহায্য করে। আমাকে দেখিয়া কিন্তু মোটেই লজ্জা করে না। সেদিন কি মনে হওয়ায় খানিকটা ঘোমটা দিয়াছিল। মা বলিলেন, তাঁহার সাম্‌নে আবার ঘোমটা কেন? সেই দিন হইতে ঘোমটার বালাই নাই।

আমার মনে হইল, ইহাতে আমাকে একটু অপমান করা হইতেছে! একদিন তাহাকে বলিলাম—সবাই তো স্বামীকে দেখিয়া ঘোমটা দেয় তুমি দেওনা কেন?

গিরিবালা বলিল, মা বারন করিয়াছেন। আমি পুনরায় বলিলাম—আর সবাই দেয় কেন? তাদের মা বুঝি বারন করেন না?

গিরিবালা উত্তর করিল—তোমাকে যে আমি আগে থেকে জানি। তুমি তো নতুন নও।

আমি দেখিলাম, কথাটা ঠিক।

বৈশাখ মাস—সকালে স্কুল হইতেছে। স্কুল হইতে আসিয়া মাকে

শুইয়া থাকিতে দেখিলাম। শুনিলাম সকালে একবার উঠিয়াই আবার শুইয়া পড়িয়াছেন। জ্বর লইয়াও মাকে কাজ করিতে দেখিয়াছি। খুব বেশী না হইলে আর মা শয্যাগ্রহণ করেন নাই। গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম গা খুব গরম। চোখ লাল। গিরিবালা বলিল—কালও জ্বর ছিল, তবে কম, মা গ্রাহ্য করেন নাই; জ্বর গায়েই সব করিয়াছেন।

১২ই বৈশাখ—মায়ের সমান অবস্থা। ডাক্তার তিন দিন হইতে দেখিতেছেন। রোগ কঠিন বলিয়াছেন। মা যদি না বাঁচেন, কি হইবে? সে কথা ভাবিতেও ভয় হয়। গিরিবালা ও আমি পালা করিয়া রাত জাগি। দিনে দুই জনেই থাকি।

১৫ই তারিখ—দুই দিন পরে সন্ধ্যাকালে মা কথা বলিলেন—আমি মরিলে তোমরা ভয় পাইও না। মাসে কিছু বাঁচাইয়া যে টাকা জমিয়াছে, এই ঘরের দক্ষিণ কোণে পোতা আছে। আমার শ্রাদ্ধের জন্য অতি সামান্য খরচ করিও। একজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচ জন গরীব লোক খাওয়াইয়া দিও। যদি ব্রাহ্মণ খাইতে আপত্তি করেন বেশী চেষ্টা করিও না। পাঁচটি গরীবকে খাওয়াইলেই আমার আত্মার তৃপ্তি হইবে।

রাত্রি বোধ হয় ১২টা হইবে। গিরিবালাকে মা চুপি চুপি কি বলিলেন। গিরিবালা একটা পুরাতন কাঠের বাক্স খুলিয়া কি একটা জিনিস মায়ের হাতে দিল। গিরিবালাকে মায়ের কাছে রাখিয়া আমি তখন একটু বিশ্রাম করিতেছিলাম। মা ভাবিয়াছিলেন আমি ঘুমাইয়া ছিলাম। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম গিরিবালার দেওয়া জিনিসটি একখানি চিঠি। পড়িবার জন্য মা চিঠিখানি হাতে লইয়াছিলেন। চিঠি হাত হইতে পড়িয়া গেল। মা গিরিবালাকে চিঠিখানি চোখের সামনে ধরিতে বলিলেন। গিরিবালা তাহাই করিল। বোধ হইল, পড়িতে পারিলেন না। যেন বড়ই দুঃখের সহিত বলিলেন আর কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিনে বৌমা।

তারপর আপনিই শান্ত হইয়া বলিলেন—তা হোক বৌমা! ব্যস্ত হোয়োনা। চিঠিখানা আমার মাথার একবার রাখ তো মা। হ্যাঁ ঠিক হয়েছে মা।

বলিয়া খানিকক্ষণ মা স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, তুমি সাবিত্রী সমান হও মা! ওখানা বালিশের তলায় রেখে একবার সঞ্জীবকে ডেকে দাও তো।

গিরিবালা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া আমাকে ডাকিল। আমি এক প্রকার কপট নিদ্রা হইতে উঠিয়া মায়ের কাছে আসিলাম। মা বলিলেন—তিনি আর বাঁচিবেন না। তুইজনে মিলিয়া কি করিয়া সংসার চালাইতে হইবে সব বলিলেন। একটা কথা আমাকে বিশেষ করিয়া বলিলেন—আমি যেন আমার পিতাকে কিছুতেই বিপন্ন না করি। যদি কখন টাকা পাইতে বিলম্ব হয় বা—ভগবান্ না করুন—টাকা পাঠানো বন্ধ হইয়া যায় তথাপি আমি যেন সে জন্য বাবার কাছে যাইবার বা টাকা আদায়ের চেষ্টা না করি।

মা আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন। আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। রাগও হইতেছিল।

শেষ রাত্রে মায়ের আদেশে আমরা দু'জনে মাকে বাহিরে তুলসী-তলায় লইয়া আসিলাম। রোজ সকালে মা একটি গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি করিতেন। আমাকে মা তাহা শুনাইতে বলিলেন! আমি সমস্ত স্তোত্রটি শুনাইলাম। ধীরে ধীরে মা চক্ষু মুদিলেন। আর ডাকিয়া সাড়া পাইলাম না। তখন তুইজনে মায়ের বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

১৬ই তারিখ—সকাল হইতেই প্রতিবাসীদের ডাকিতে গেলাম। তাঁহারা বলিলেন—তোমার মায়ের স্বভাব তেমন ভাল ছিল না। প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া লও, তবে আমরা ছুঁইব। মায়ের স্বভাবের দোষ

দেওয়াতে বড়ই রাগ হইল। কিন্তু সব জায়গা হইতে ঐ একই উত্তর পাওয়াতে দমিয়া গেলাম। তখন মনে পড়িল আমাদের অঙ্কের শিক্ষকের কথা। তাঁহার কাছে গিয়া সব কথা বলিলাম, তিনি তৎক্ষণাৎ আমাদের সঙ্গে আসিলেন। তাঁহার সাহায্যে ও পরামর্শে আমি ও গিরিবালা মাকে শ্মশানে আনিলাম ও দাহকার্য্য সমাধা করিলাম।

গিরিবালা সারাপথ কাঁদিতে কাঁদিতে আসিল। আমার চোখের জল শুকাইয়া গিয়াছিল। এখন পৃথিবীতে আমাদের আর কেহ রহিল না।

এইখানে একখানি খাতা শেষ হইয়াছে। সুরেশবাবু খাতাখানা বন্ধ করিয়া স্ত্রীর পানে চাহিলেন। চোখের জল মুছিয়া সুশীলা সুন্দরীর আঁচল ভিজিয়া উঠিয়াছিল।



দ্বিতীয় খাতাখানি খুলিতে সুশীলাসুন্দরী বলিলেন, তুমি একা একা পড়। আমি আর এ দুঃখের কাহিনী শুনিতে পারি না। আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়।

সুশীলা চলিয়া গেলেন। সুরেশবাবু একা বসিয়া পড়িতে লাগিলেন।

আষাঢ়।—মায়ের মৃত্যুর পর দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে। মা মারা গিয়াছেন ইহা যেন এখনও বিশ্বাস করিতে পারি না। স্কুল হইতে আসিবার সময় মনে হয়, বুঝি মা বলিয়া ডাকিতেই মা আজিও দরজা খুলিয়া দিবেন। যে পিতার মর্ম্ম জানে না, মা হইতে বঞ্চিত হইলে তাহার যে কি কঠিন আঘাত লাগে তাহা আমার মতো অভাগারাই বুঝিতে পারিবে।

আশ্বিন।—এক রকম মাসগুলা কাটিয়া যাইতেছে। ক্লাসের দুই

চারিটি করিয়া ছেলেরা নিয়ম করিয়া ঠাট্টা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রমথ বলিয়া যে কুড়ি বছরের ছেলেটি তিন বৎসর হইতে ক্লাসে আছে, সেই সব চেয়ে বেশী জ্বালাতন করে।

বলে—মজা তো তুইই লুট্‌ছিস্ রে। এই বয়সে বৌয়ের রান্না ভাত খেয়ে আসছিস্। তোর মতো বরাত কার?

মার মৃত্যু সমন্ধে এই ভাবে কথা বলায় চোখে জল আসিল। বলিলাম আমি তোমার কি করিয়াছি যে আমার সঙ্গে তুমি এমন শত্রুতা কর! তোমার মা-বাপের সম্বন্ধে যদি তোমাকে এমন কথা বলি, তাহলে তুমি কি কর? প্রমথ তাচ্ছিল্য করিয়া উত্তর দিল—ওরে বলাবলি কথা ছেড়ে দে। আমার মা-বাবা—বিশেষ করে বাবা—যদি এখন অক্কা পান্, এখনি আমি ১৬ বৎসরের রাঙ্গা-বৌ বিয়ে করে এনে তোর সঙ্গে টেক্কা দিয়ে বসি। বাবাটা বলেছে কি জানিস্, যত দিন আমি ম্যাট্রিকুলেসন পাস না করতে পারি তত দিন বিয়ের কথা মুখে আন্‌তে পাবে না। মাটাও এমনি হাবা যে, একটা কথা কইলে না। আমিও বাবা মৌরুসি নিয়ে বসে আছি; কে পাশ করে দেখি। প্রমথ কি অসভ্য! দয়া মায়ার নামও ওর মনে নাই। ওর সঙ্গে কথাই কইব না।

কার্ত্তিক।—প্রমথ হঠাৎ কাল ক্লাসে সকলের সম্মুখে বলিল, তোর বৌ তো বেড়ে, কাল তোদের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল দেখলাম।

ক্লাস সুদ্ধ সবাই হাসিতে লাগিল।

ক্লাস-টিচারের কাছে নালিশ করায় তিনি একটু হাসিয়া প্রমথকে বারণ করিয়া দিলেন। স্কুল ছুটি হইলে প্রমথ আরও বাড়াইল। বাড়ী আসিয়া গিরিবালাকে খানিক বকিলাম। তাহার জন্যই তো আমাকে এত কথা সহ্য করিতে হইল! রাত্রে মনটা বড় খারাপ হইল। তাহার কি দোষ?

৩০ অগ্রহায়ণ।—এ মাসে টাকা আসিল না। বাংলা মাসের প্রথমেই বরাবর আসে। এ বার তো মাস শেষ হইল। যা কিছু মা বাঁচাইয়া ছিলেন প্রায় সবই তাঁহার শ্রাদ্ধে ব্যয় করিতে হইয়াছিল। কষ্টে সৃষ্টে মাসটা কাটিল।

পৌষ—টাকা নাই একেবারেই। গিরিবালার সোনার দু'টি মাকড়ী বেচিয়া স্কুলের বেতন দেওয়া হইল ও কোন মতে এক বেলা খাওয়া চলিল। এবার কি হইবে? চিঠি লিখিব। কিন্তু কাহাকে লিখিব? যে পিতা সুধু কয়টি টাকা পাঠাইয়া এতদিন সব কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন তাঁহাকে কি বলিয়া পত্র আরম্ভ করিব? তাহার উপর টাকা আসিত অন্য লোকের হাত দিয়া। তাঁহার তো ঠিকানাই জানি না।

বাৎসরিক পরীক্ষা হইয়া গেল।

ফার্ষ্ট ক্লাশে প্রমোশন পাইলাম, কিন্তু এবার ফোর্থ হইয়া গেলাম। বাড়ী ফিরিয়া খুব এক চোট কাঁদিলাম। ফার্ষ্ট হইব, বৃত্তি পাইব, উচ্চ শিক্ষা পাইব, এসব উচ্চাশা আমার জন্মের মতো শেষ হইতে চলিল। গিরিবালা আমাকে সান্ত্বনা দিতে আসিল। তাহাকে দু'হাত দিয়া ঠেলিয়া দিলাম। আমার দুঃখ সে কি বুঝিবে?

মাঘ।—স্কুল ছাড়িয়া দিলাম। যাহাদের সঙ্গে পড়িতাম, তাহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ একেবারে বন্ধ করিয়া দিলাম। কিন্তু খাইব কি! যে লেখাপড়া শিখিয়াছি তাহাতে তো চাকরী মেলা দায়। রেলে শুনিয়াছি এ লেখা পড়াতেও চাকরী হয়। কিন্তু এখান হইতে তো রেল বহু দূর। গিরিবালাকে একা রাখিয়া কি করিয়াই বা তত দূরে চাকরীর চেষ্টায় যাই? মা যাইবার সময়ে শত্রুতা সাধিয়া পায়ে শিকল পরাইয়া গিয়াছেন। একবার তাঁহাদের সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিব?

যেমন তিনি আমাদের দায়িত্ব ভুলিয়া আমাদের কষ্টের একশেষ

করিয়াছেন তেমনি তাঁহাকেও বিপদে ফেলিব ? সকলকে জানাইয়া দিব কেমন ভদ্র তিনি। কিন্তু মা যে মরিতে বসিয়াও বারন করিয়া গিয়াছেন। অন্ন চিন্তার চেয়েও যে তাঁহার স্বামীর মানের চিন্তা বেশী হইয়াছিল।

তবে আর ভিক্ষার ঝুলি লইয়া তাঁহাদের দ্বারে যাইব না। কিন্তু পেট জ্বলিতেছে। অন্নের ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার।

ফাল্গুন।—অনেক চেষ্টা করিয়া শ্যামদাস কুণ্ডুর মুদিখানার দোকানে একটা কাজের যোগাড় করিলাম। বেতন মাত্র আট টাকা। ভবিষ্যতে কত বড় হইব কত না কল্পনাই করিয়াছিলাম। সব শেষ হইল। শেষটা কি না এক মুদিখানার দোকানের আট টাকা মাহিনার গোমস্তা!

ফাল্গুন।—এক বৎসর এই মুদিখানার দোকানে কাজ করিয়াছি। শ্যামদাস জাতে তিলি।

দোকানে আরো তিন জন লোক আছে। বেশ বড় দোকান। এই এক বৎসর কি হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খাটাইয়া লইয়াছে! ভোর ৬টা হইতে বেলা ১২টা, আবার ২টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত একেবারেই ৯ঘণ্টা খাটুনি। খাতা লেখা মনিব শিখাইয়া দিয়াছেন।

কেহ উপস্থিত না থাকিলে চাল ডাল ও ময়দাও বিক্রয় করিতে হইত। আমি দোকানে গেলে শ্যামদাস হাত তুলিয়া প্রণাম করিত। আবার প্রায়ই বেলা ৯টা ১০টার সময় বলিত, ঠাকুর এই বাজারটা চট্ করে আমাদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এস তো। আসার সময় তোমার বাড়ী থেকে জল টল খেয়ে এসেছিলে ? ছেলে মানুষ এখন না খেলে পারবে কেন ? কি দয়া!

চৈত্র। আর ডায়েরী লিখিয়া কি হইবে ? দোকানদারের গোমস্তার কি আর ডায়েরী লেখা শোভা পায়! দু'জন ভাল লোকের সঙ্গে দেখা হয় না, দু'টো ভাল কথাও শুনিতে পাই না। আর কুণ্ডু মহাশয় ও তাঁহার দোকানের গোমস্তা কি মুখ খারাপই করে! নিজের ছোট ছেলের সম্মুখেও

মুখ সাম্‌লাতে পারে না। এক একবার ভাবছি এ চাকরী ছেড়ে দিব। কিন্তু কি খাইব?

তিন বৎসর পরে। পৌষমাস। উঃ কত পরিবর্ত্তনই হইয়া গিয়াছে। এখন যাহাদের সহিত অনায়াসে মিশিতেছি আগে ঘৃণা হইত। এখন আমি ইহাদের মধ্যে একজন। সেদিন একটা চাষার-বৌ কি কিনিতে আসিয়াছিল; কুণ্ডু মহাশয়ের ভাইপো তাহার সহিত এমন বিশ্রী রসিকতা করিল, সকলেই হাসিয়া উঠিল। আমিও যোগ দিলাম। প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা। ছি! কি অবনতিই আমার হইয়াছে। ২০ বৎসর বয়স হইয়াছে আমার। কোথায় উন্নতি করিব কত! তা নয় কি হইলাম! আর ডায়েরী লিখিয়া কি করিব? কেবল তো কলঙ্কের কাহিনী।

ভাবিয়াছিলাম আর কখন ডায়েরী লিখিব না কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া কি করিব। কাল হইতে চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছি।

ছাড়িয়া দিয়াছি ঠিক নয়। ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছি। কুণ্ডু মহাশয়ের ভাইপো একদিন আমাকে তাগাদায় পাঠাইবার জন্য ডাকিতে আসিয়াছিল। সে সময় উঁকি মারিয়া গিরিবালাকে দেখিয়া গিয়াছিল। তারপর শুনিলাম, আমি দুপুরের পর, সন্ধ্যার পর যখন দোকানে থাকি সেই সময় দুই দিন বাড়ী চড়াও করিয়াছিল। গিরিবালা তাড়াতাড়ি দুয়ার বন্ধ করিলে দুয়ারের কাছ হইতে দু'চারিটা কুৎসিত কথা বলিয়া গিয়াছিল। তাহার অনুগ্রহ হইলে আমার আর কোন দুঃখ থাকিবে না এ ভরসাও দিয়াছিল। বাড়ী আসিলে গিরিবালা কাঁদিয়া ভাসাইল। পর দিন একটু চালাকি করিলাম। সন্ধ্যার আগে একটা ছুতা করিয়া বাড়ী আসিয়া একগাছা লাঠি হাতে ঘরের পিছনে জানালার একটু কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম। নির্লজ্জ গোপীনাথ সে দিন আসিয়া দেখিল, জানালা খোলা।

আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া বার কয়েক আস্তে আস্তে শীষ দিয়া গিরি গিরি বলিয়া ডাকিল। রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। যেন ওর চোদ্দ পুরুষের গিরি। লাঠি গাছ বাগাইয়া ধরিয়া পায়ের গোছে এক বাড়ি! বাবাগো বলিয়া গোপীনাথ চীৎকার করিয়া সেখানে পড়িয়া গেল, আমি তাহার উপর তাহার গালে এক চড় লাগাইয়া পিছন দিয়া দৌড়িয়া বাড়ীর ভিতরে আসিলাম। দুই চারিজন লোক জমা হইয়াছিল। তারপর সে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে কোন রকমে বাড়ী পৌঁছিয়াছিল। প্রহার সাংঘাতিক হয় নাই। তবে ২।৪ দিন আর পাড়ায় পাড়ায় সে সাধুবৃত্তি করিয়া বেড়াইতে পারিবে না।

ইহার পর আর উহাদের দোকানে গিয়া কি করিয়া চাকরী করিব? সেদিন হইতে ওদের দোকানের চাকরী শেষ করিলাম। ১২ দিন কাজ করিয়াছি। একদিনেরও মাহিনার আর আশা নাই কুণ্ডু মহাশয়ের কাছে।

চৈত্র। জমিদারবাবুদের সখের থিয়েটার আছে। তাহারা আমাকে একদিন ডাকিয়া লইয়া গেল। বলিল, আমি থিয়েটার করিলে আমাকে সেখানে থাকিতে দিবে ও ১০৲ টাকা করিয়া মাহিনা দিবে। আমি স্বীকৃত হইলাম। গোঁপ কামাইয়া নায়িকা সাজিতে হইবে। রিহার্সেল দিতে বড়ই লজ্জা করিত। ক্রমশঃ সহিয়া গেল। তাহারা চরস গাঁজা, কখন কখন মদ পর্য্যন্ত খাইত। প্রথম প্লের দিন আমাকে একটু মদ খাওয়াইয়া দিল। ধীরে ধীরে আমারও সব রকম নেশা অভ্যাস হইতে লাগিল। আর ডায়েরী লিখিব না। এই শেষ।

এক বৎসর পরে। আষাঢ়। ৭ তারিখ। একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। পোড়ারমুখী, কেন মরিতে এ বাড়ীতে আসিলি? বাবুদের সখ কমিতেছে। এর পর কি খাওয়াইব?

ইহার পর আর ডায়েরী নাই।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুরেশবাবু খাতা বন্ধ করিলেন, এই হতভাগ্যের ঘরের ইতিহাসটুকু বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি ভাবিলেন হায়, অভাগা সঞ্জীব।

৬

সাত মাসের একটা ছেলেকে কোলে হইয়া ফণীন্দ্রের স্ত্রী উষারাণী শাশুড়িকে দেখাইয়া এই কথা বলিল। ছেলেটা সুন্দর হৃষ্ট পুষ্ট। মাথার চুল সূক্ষ্ম, সুন্দর, ও কুঞ্চিত হইয়াছে। ভ্রূ’টি কে যেন কাজল দিয়া আঁকিয়া দিয়াছে। দুই হাতে শিশুকে মুখের সাম্‌নে তুলিয়া ধরিয়া মাথাটি একবার নাড়িয়া খোকার পেটের উপর ঈষৎ চাপিয়া ধরিতেই খোকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বৈশাখের মধ্যাহ্ন। সুশীলাসুন্দরী দিনে না ঘুমাইয়া ঘরের মেঝেতে সতরঞ্চির উপর একটা শীতলপাটি বিছাইয়া চোখে চশমা লাগাইয়া একখানা বাংলা মাসিকপত্র পড়িতেছিলেন। পুত্রবধূ আসিতেই বই হইতে মুখ তুলিয়া পৌত্রের পানে চাহিলেন। শিশুর হাসি দুই জনে আনন্দোজ্জ্বল মুখে দেখিতে লাগিলেন, এই এক এক টুকরা হাসি যেন পারিজাতের এক একটি পাপড়ি। কোন নন্দন কানন হইতে কি করিয়া এ ধরায় উড়িয়া আসে আবার মিলাইয়া যায়।

সুশীলাসুন্দরী বই বন্ধ করিয়া দুই হাত পাতিয়া পৌত্রকে কোলে লইতে গেলেন। পৌত্র একটু খানি চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া মায়ের কাঁধে মুখ রাখিল।

উষা হাসিয়া বলিল—চশমা খুলে রাখুন আগে।

তাইত ছেলের আবার সব দিকে দৃষ্টি আছে, বলিয়া সুশীলাসুন্দরী চশমা খুলিয়া খাপের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। এবার হাত পাতিতেই খোকা ঝাঁপাইয়া ঠাকুরমার কোলে গেল। ঠাকুরমা আদরে চুম্বনে ডুবাইয়া খোকাকে কোলে বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ বৌমা! ফণী তোমাকেও চিঠি দিবে না? আমাকে তো অনেক করে বকেছে।"

বধূ সলাজে হাঁ বলিয়া জিজ্ঞাসু নয়নে শাশুড়ির পানে চাহিল।

সুশীলা বলিলেন—ফণীকে লিখেছিলাম, দিন কয়েকের জন্য তোমাদের নিয়ে যেতে। গরমের দিন, একেই কিছু খেতে পারে না, তার ওপর ঠাকুরের রান্না সে কি আর মুখে করতে পারে? দেখনা পড়ে চিঠিখানা, বালিশের নীচে আছে।

উষা নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে তখন চিঠি লইয়া মনে মনে পড়িতে লাগিল।

ফণী লিখিয়াছিল, খোকা ও উষাকে তাহার কাছে পাঠাইবার জন্য পিতামাতার এত ব্যস্ত হইবার কারণ সে বুঝিতেছে না। উষা কি তাঁহাদের কোন প্রকারে অসন্তুষ্ট করিয়াছে?

বিদেশে তো অনেক লোকেই থাকিতেছে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জন ঠাকুরের রান্না থাইয়া ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছে? খোকাকে ছাড়িয়া থাকিতে যে তাঁহাদের কষ্ট হইবে এ কথাটা কি এতদিনে সে বুঝে নাই? তাহার পিতামাতা কি যত্নে কি স্নেহে তাহাদের মানুষ করিয়াছেন সে কথা ভুলিবার সময় এখনও তাহার হয় নাই। ছুটি পাইলে যখন সে আসিতেছে তখন, মা বড় কষ্ট বলিয়া কেন এত ব্যাকুল হন! নিজে ত সে বাপ মায়ের সেবা করিতে পারিতেছেনা, যারা কাছে থাকিতে পারে তারাও যদি না করে তা কতখানি অন্যায় হইবে।

পরিশেষে ফণী লিখিয়াছে, মা যেন না ভাবেন তাঁহার মনের ইচ্ছা খোকাদের আসা, কিন্তু সে কথা লজ্জায় বলিতে পারিতেছে না; মা কি

ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আজ পর্য্যন্ত কোন কথা সে মায়ের কাছে গোপন করে নাই ?

চিঠি শেষ করিয়া খামের মধ্যে পূরিয়া ঊষা পুনরায় বালিশের নীচে রাখিয়া দিল।

সুশীল বলিলেন, "দেখ্‌লেতো বৌমা চিঠি। কথা অমন গুছিয়ে বলতে কেউ পারবে না।" ঊষা মনে মনে বলিল, তবু তো মা আমার চিঠিখানি দেখেন নি।

প্রকাশ্যে বলিল—আমার চিঠিতে আবার এর চেয়ে বেশী আছে। এই দেখুন মা এই পাতাটা পড়ে।

বলিয়া বস্ত্রান্তরালে লুক্কায়িত একখানি পত্র বাহির করিয়া একটা পাতা মুড়িয়া শাশুড়ির হাতে দিয়া ঊষা পলাইল।

সুশীলাসুন্দরী সুধু নির্দ্দিষ্ট পাতাখানি পড়িলেন।

ফণী লিখিয়াছিল—তুমি যে কোন অসন্তোষ প্রকাশ কর নাই তাহা আমি খুবি জানি। হয়ত তোমার মনে কোন দিন এই ভাব উদয় হইয়া থাকিবে, কলিকাতায় থাকিলে বেশ হইত, মুখে সে দিন হয়ত তাহারি একটা ছাপ পড়িয়া গিয়াছিল ; হয়ত বা একটা নিঃশ্বাসও জোরে বহিয়াছিল। তোমাকে তো কতবার বলিয়াছি, আমার মায়ের চোখে এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। মানুষের মুখ দেখিলে তিনি অন্তরের কথা বুঝিতে পারেন। হয়ত বা এই করিয়া মার কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছ।

আমার এই অনুমান ভুলও হইতে পারে। আর যদি ঠিক হয় তো সে ভাবনা মন হইতে দূর করিও।

আমি পিতামাতার সেবা করিতে পারিতেছি না, তুমি করিতেছ। আমার প্রাণ যাহা করিতে চায় তাহাই তোমার দ্বারা হইতেছে। ইহাতে আমাদের প্রাণের মিলন অচ্ছেদ্য ও নিবিড় হইতেছে। যে ভালবাসার

মধ্যে সংযম নাই, তাহার কল্যাণও নাই ও তাহার শেষ রক্ষা হয় না। ইহাতো আমাদের দু'জনেরই মত। অন্য সব কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া আমরা দু'জনে একত্র থাকিব ইহা কি অসংযম নয় ?

এইটুকু পড়িয়া পুত্রগর্ব্বে সুশীলাসুন্দরীর হৃদয় ভরিয়া উঠিল ; ছল ছল চক্ষে পত্রের সুন্দর মুক্তার মতো অক্ষরগুলির দিকে স্নেহভরে খানিকক্ষণ চাহিয়া অন্তরালে নিকটে কোথাও লুক্কাইত পুত্রবধূকে ডাকিলেন, "বৌমা, শোন মা।"

৭

শ্রাবণের অপরাহ্ণ। সকাল হইতে আজ বর্ষা নামিয়াছে। এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যায়, খানিকটা বন্ধ থাকে। আবার গুঁড়ি গুঁড়ি আরম্ভ হয় ; শেষে আবার এক পশলা জল। এইরূপে সমস্ত দিন কাটীয়াছে।

অপরাহ্ণে কিছুক্ষণ বর্ষণ বন্ধ আছে। পথ ঘাট অত্যন্ত পিছল। গ্রামের লোক খালি পায়ে পথ চলিতেছে। দূরের পথিক কেত খালি পায়ে, কেহ জুতা ও মাথা সাবধানে ছাতার আড়ালে বাঁচাইয়া যাইতেছে, দূরে কোথাও বৃষ্টি হইতেছে তাই মাঠের মাঝখান দিয়া সে জায়গাখানি ঝাপ্‌সা দেখাইতেছে। সকলেই ব্যস্ত হইয়া চলিতেছে, ভাবিতেছে এই পথটুকু শেষ করিয়া বাড়ী পৌঁছিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইব—তা হোক্‌না কেন বাড়ী জীর্ণ ও পুরাতন, আর হোক্‌না তাহার ছাদ ছিদ্রবহুল।

আজ ফণীন্দ্র কলিকাতা হইতে আসিবে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আসিবার কথা। সুরেশবাবু এখনও কোর্ট হইতে ফিরেন নাই। সুশীলাসুন্দরী

এক একবার আকাশের দিকে চাহিতেছেন আর ভাবিতেছেন আর এক পশলা বৃষ্টি আসিবার আগেই ফণী যদি পৌঁছায় তবে ভাল হয়।

উষা মনে মনে আকাশকে গালি পাড়িতেছিল। বৃষ্টি আর দিন খুঁজিয়া পাইল না তাই আজিকার দিন বুঝিয়া ঘোর করিয়া আসিল। মুখে কিন্তু উষা কিছুই বলিতে পারিতেছিল না।

সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে সুরেশবাবু কাছারি হইতে ফিরিলেন। ফণীন্দ্র তখনও পৌঁছে নাই শুনিয়া বলিলেন—"পথে বোধ হয় জলের জন্য কোথাও দেরী কর্‌ছে। নইলে তো এতক্ষণ পৌঁছে যাবার কথা।"

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে সুশীলাসুন্দরী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। উষা নানা ছুতায় ঘর বাহির করিতে লাগিল। শেষটা মাথা ধরিয়াছে বলিয়া বিছানায় খানিকক্ষণ পড়িয়া রহিল। সুরেশবাবু তাঁহার এক চাপরাশীকে ডাকিয়া একটু আগাইয়া দেখিতে বলিলেন।

আস্তে আস্তে উষার পায়ে কে সুড়সুড়ি দিতেই উষা 'কে' বলিয়া পা গুটাইয়া উঠিয়া বসিল। মণীন্দ্র হাসিয়া বলিল, "চুপ-বৌদিদি! আমি তোমার মাথা ধরা সারিয়ে দেব।"

উষা লজ্জা পাইয়া হাসিয়া বলিল, "কি করে' ?"

মণীন্দ্র পরিহাসটাকে সহজ করিয়া আনিয়া কহিল—"দাদা এখনও পৌঁছুন্ নি বলে তোমরা ভাবছ তো! আমি এগিয়ে গিয়ে তোমাকে খবর এনে দিচ্ছি।"

উষা বলিল, "হীরু চাপরাশী তো গেছে ঠাকুরপো! তুমি আর কেন যাবে ?"

মণীন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিল—"তোমার হীরু ফিরে আসবার ঢের আগে আমি খবর দেব। আমি সাইকেল করে যাব।"

"এ বৃষ্টিতে অন্ধকারে ?"

"তা হোক ; আলো থাক্‌বে তার আর ভয় কি !"

"বাবা কি বল্‌বেন ?"

বৌদিদির নির্বুদ্ধিতায় মণীন্দ্র হাসিয়া বলিল, "কাউকে বলে যাব না। তাইতো তোমাকে চুপি চুপি বল্‌তে এলাম। আমার পড়বার ঘরে cycle আছে, আমি সেখান থেকে আস্তে আস্তে চলে যাব। তুমি এক একদিন আমার সঙ্গে বসে যেমন পড়াশুনো কর, সেই রকম করগে, তাহলে কেউ কিছু ভাববেন না।"

"এখন যদি তোমার মাষ্টার আসে !"

"আজ ছুটি, আজ তিনি আসবেন না। তুমি একটু পরেই যেয়ো যেন। আমি আধঘণ্টার মধ্যেই তোমাকে খবর দেব। বাইরের ঘরেই থেকো।" বলিয়া মণীন্দ্র চলিয়া গেল।

পড়িবার ঘরে stand হইতে cycle খানা নামাইয়া লইয়া ছোট লণ্ঠনটি তাহাতে লাগাইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে চট করিয়া বাহির হইয়া গেল। আলো পরে জ্বালিবে ভাবিয়া দেশলাই পকেটে রাখিয়াছিল।

বৌদিদির মাথাধরার কারণ অনুমান করিয়া মণীন্দ্র ঔষধ ব্যবস্থা করিবার জন্য এইরূপে বাহির হইয়া গেল।

আধ ঘণ্টার আগেই cycle হইতে নামার ও cycle উপরে উঠানোর শব্দ শুনিয়া উষা ভিতর হইতেই জিজ্ঞাসা করিল, "ফিরলে ঠাকুরপো ?"

"হ্যাঁ ফিরেছি—তবে ঠাকুরপোর দাদা !"

উষা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল—cycle হাতে দুয়ারের সম্মুখে ফণীন্দ্র হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া।

"তুমি cycle করে' এলে, ঠাকুরপো কই ?"

"সে গাড়ীতে আছে। তোমাকে বুঝি সে এখানে বসিয়ে রেখে গেছে ?"

"হ্যাঁ, বল্লে আমি তোমাকে এক্ষণি খবর দিচ্ছি।"

"দুষ্ট আমাকে গিয়ে বল্লে—দাদা, আমি তোমার গাড়ীটায় চড়েনিই ; তুমি cycle খানায় যাও না। যখন cycleএ উঠেছি তখন বল্লে পড়বার ঘরে cycle খানা তুলে রেখ—দুয়োর ভেজান আছে। দুষ্ট দেখেছ !"

পরিহাসপ্রিয় স্নেহ-প্রবণ ভাইটির কথা মনে করিয়া ফণীন্দ্র হাসিয়া উঠিল। উষা মনে মনে বলিল ঠাকুরপোর কি বুদ্ধি !

ফণীন্দ্র বলিল—"চল ভিতরে যাই।"

"রোসো আমি আগে পালাই।"

বলিয়া উষা আনন্দে ও লজ্জায় আগেই ছুট দিল।

৮

ফণীন্দ্র আসিয়া প্রণাম করিতেই সুশীলাসুন্দরী বলিলেন—"এসেছিস্ বাবা ! বাঁচলাম। আমরা ভেবে মরছিলাম কেন এত দেরী হচ্ছে !"

সুরেশবাবু বলিলেন—"হীরু খুঁজতে গেছে দেখা হয়েছে ? কিন্তু কই, তোমার গাড়ীর তো শব্দ শুনতে পেলাম না ?"

ফণীন্দ্র একটু হাসিয়া বলিল, "গাড়ী এখনও পৌঁছায়নি যে বাবা ! তা কি করে শব্দ পাবেন।"

বিস্মিত হইয়া সুরেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, তুমি কি তাহলে গাড়ী ছেড়ে হেঁটে এলে ?"

ফণীন্দ্র বলিল—"মণি যে চুপে চুপে cycle নিয়ে আমাকে আগাতে গেছল। সে বল্লে—সকলে ভাবছেন কিন্তু আমাকে কেউ একটিবার

বল্‌লেন না যে cycle করে গিয়ে দেখে এস। তারপর সে আমাকে cycle করে পাঠিয়ে দিয়ে সে গাড়ীতে আস্‌ছে।"

সুরেশবাবু ও সুশীলাসুন্দরী উভয়ে হাসিয়া উঠিলেন। সুশীলা বলিলেন—"দেখেছ একবার ছেলের বুদ্ধি! সব তাতে কি করে' যে বেড়ায়!"

সুশীলাসুন্দরী পুত্রের কাপড় জামায় হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া কহিলেন—"ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেল বাবা। হাত মুখ ধুয়ে নে। চা খাবি তো?"

সুশীলাসুন্দরী উঠিতে গেলেন। তাঁহার চিরদিনকার অভ্যাস, ছেলেদের কোন কিছু দরকার হইলেই কাহাকেও আদেশ না করিয়া তিনি নিজেই তাহা করিতে যান্।

ফণী বলিল—"মা তুমি তা বলে চা করতে যেও না।"

সুশীলা হাসিয়া বলিলেন—"কেন রে তাতে দোষ কি? চাওতো খাবার জিনিস।"

"তা হোক্ মা। তুমি চা তৈরী করবে কি চা হাতে করে নিয়ে আসবে—এ মনে হলে যেন কি রকম হয়। বয়সে ও সম্পর্কে যারা ছোট তারাই চা করবে।"

সুরেশবাবু এতক্ষণ হাসিমুখে মাতা ও পুত্রের বাদ প্রতিবাদ শুনিতেছিলেন। স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা বৌমাকে বলগে তৈরী করতে। হয়ত বা তিনি এতক্ষণ আরম্ভই করেছেন।"

ফণী গৃহান্তর হইতে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া হাতমুখ ধুইয়া পিতার কাছে আসিয়া বসিল।

বাড়ীর সম্মুখে একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। ফণী বলিল—"মণি এল বোধ হয়।"

একটু পরে হীরু চাপরাশী বাহির হইতে নত হইয়া বলিল—"হুজুর বড়বাবু ছোটবাবুর সাইকেলে আগেই এসেছেন। ছোটবাবু আর আমি গাড়ীতে একসঙ্গে এলাম। জিনিসপত্র সব তোলা হয়েছে।"

সুরেশবাবুর আজ্ঞা পাইয়া হীরু চলিয়া গেল। সুরেশবাবু হাসিয়া বলিলেন—"হীরু খুব আগে নতুন খবর দিয়ে গেল।"

সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

একটু পরেই মণি অতি শান্ত ছেলের মতো ঘরে আসিয়া বসিল।

সুশীলাসুন্দরী বলিলেন—"দেখছ গা কি শান্ত শিষ্ট ছেলে আমার। যেন কিছুই জানে না, দাদার আসার খবর পেয়ে এই মাত্র আস্ছে।"

মণি মায়ের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া মাথা নীচু করিয়া রহিল। কান দু'টি রহিল পিতার কথার দিকে। পিতাকে বলিয়া যাওয়া উচিত ছিল ইহা মণি বাহির হইয়া অবধি বুঝিয়াছেন। কাজ ও কাজের উৎসাহ সাঙ্গ হইয়া গেলে যেটুকু অন্যায় হইয়াছিল তাহাই মনে হইতেছিল।

সুরেশবাবু বলিলেন—"মণি তুমি কাজ ভালই করেছ; কিন্তু আমাদের কাউকে বলে যাওয়া উচিত ছিল। তোমার যদি দেরী হ'ত আমাদের ভাবনা আরও বেড়ে যেত!"

মণি ধীরে ধীরে বলিল, "আমি বৌদিদিকে বলে গেছলাম।"

সুরেশবাবু কিছু বলিবার আগেই উষা ও শান্তি খাবার ও এক এক পেয়ালা চা আনিয়া দুই ভাইয়ের সম্মুখে রাখিল।

শ্বশুরকে, উষা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আপনাকে এক পেয়ালা চা এনে দেব?"

সুরেশবাবু হাসিয়া বলিলেন—"না, মা!"

"একটু বেশী দুধ চিনি দিয়ে এক পেয়ালা দিই না বাবা!"—উষা মিনতি করিয়া কহিল।

শান্তি বলিল—"বৌদিদি বল্‌ছিলেন, আজ সুন্দর চা হয়েছে। আপনি খান তো বেশ হয়।"

সুরেশবাবু সস্নেহে পুত্রবধূর পানে চাহিয়া বলিলেন—"তাই নাকি মা! তাহলে অবিশ্যিই তোমাদের চায়ের ঐ যে কষা স্বাদটা থাকে তাকে তোমরা খুব সুন্দর বলে থাক—অর্থাৎ ট্যানিক এসিডটা আমি সইতে পারিনে।"

উষা তখনি গিয়া শ্বশুরকে চা আনিয়া দিল। তিনি তাহা আরও খানিক ঠাণ্ডা করিয়া চুমুক দিয়া নিঃশেষ করিলেন।

উষা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, ভাল লাগল না?" সুরেশ বাবু বলিলেন, "বেশ লেগেছে মা!"

বাড়ীতে উষা ব্যতীত কেহই নিয়ম করিয়া চা খান না, তবে উষার আগ্রহ অনুরোধে সকলকেই মাঝে মাঝে চা খাইতে হয়।

এই চা খাওয়ার একটা ইতিহাস আছে।

উষার বাপ সিমলায় কাজ করিতেন। সেখান হইতে চায়ের অভ্যাসটি উষা পূরাদস্তর অভ্যাস করিয়া আসিয়াছিল। এই যুগে এবং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে যে চায়ের চলন নাই, একথা উষার পিতা ধারণা করিতে পারেন নাই। সেজন্য উষার শ্বশুরকে আর এ কথা বলা দরকার বিবেচনা করেন নাই।

এদিকে উষার চা খাওয়ার কথাটা কেহই চট্ করিয়া ধরিতে পারিত না—যদি না মণি এ সত্যটি আবিষ্কার করিয়া ফেলিত। একদিন এক অতিথির জন্য বাড়ীতে চা তৈয়ারি হইতেছিল আর উষা লুব্ধনেত্রে তাহারি পানে চাহিয়া হয়ত বা জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল। মণি উষাকে অন্তরালে ডাকিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেন—"বৌদি চা খাবে?" উষা আর সেদিন সত্য গোপন করিতে পারে নাই। সেই দিনই মণি

মাকে চুপি চুপি বলে যে, তাহার বৌদিদির চা খাওয়ার অভ্যাস আছে। ইহারি ফলে আর কেহ না খাইলেও সুধু উষার জন্য সেই দিন হইতে চা হইয়া থাকে। উষা ইহার জন্য প্রথমটা সংকুচিত হইয়া থাকিত, কিন্তু শাশুড়ীর স্নেহে ও ঔদার্য্যে ক্রমশঃ সে সংকোচ দূর হইয়াছিল। সুশীলা ভাবিতেন, এতদিন মুখ ফুটিয়া চায়ের কথা না বলিতে পারিয়া বাছা কি কষ্টটাই পাইয়াছে।

উষার অনুরোধে মণি প্রায়ই চা খাইত। সুশীলাসুন্দরীও একেবারে নিস্কৃতি পাইতেন না। আজ বর্ষা, কাল ঠাণ্ডা বেশী এইরূপ একটা না একটা কারণ দেখাইয়া মাসের মধ্যে অন্ততঃ ৭।৮ দিন তাঁহাকে চা না খাওয়াইয়া ছাড়িত না।

আজ যখন চা খাওয়া উপলক্ষ্যে সকলে কেহ কাছে কেহ বা দূরে একত্র হইলেন সুরেশবাবু একবার সকলের পানে তৃপ্ত চক্ষে চাহিয়া দেখিলেন।

ইন্দুকে কাছে ডাকিয়া আদর করিয়া সুরেশবাবু বলিলেন, "এই তোমার বড়দাদা ; প্রণাম কর।"

ইন্দু ফণীকে দেখিয়া অবধি এদিকে আসে নাই। সুরেশবাবুর ডাকে অতি সংকুচিত ভাবে আসিয়া ফণীকে প্রণাম করিল।

ফণী মেয়েটির মাথায় হাত দিয়া—আদর করিয়া বলিল—"বেশ মেয়েটি তো। ইন্দু নামটিও বেশ।"

এই মিষ্ট কথা ইন্দুকে যেটুকু আনন্দ ও উৎসাহ দিয়াছিল তাহা তাহার সংকোচের আড়ালেই লুকাইয়া গিয়াছিল। প্রণাম করিয়া সে ধীরে ধীরে উষার কোলের কাছটিতে গিয়া বসিল। উষাকেই সে এ সংসারে সব চেয়ে আপনার বলিয়া চিনিয়াছিল!

পিতৃমাতৃহীন সুন্দর মেয়েটি, সে অত্যন্ত নির্ভরতার সহিত তাহার স্ত্রীর

কাছে গিয়া বসিল এ দৃশ্যটি ফণীর চক্ষে বড়ই ভাল লাগিল। গভীর ভক্তির সহিত সে পিতার পানে চাহিয়া বলিল—"বাবা, ইন্দুকে এনে আপনি খুব ভাল করেছেন। এ ছাড়া এর আর কোন প্রতিকার ছিল না।"

তার পর পিতা পুত্রে অনেক কথাই হইল। মাঝে মাঝে অন্য সকলে কথায় যোগ দিতেছিলেন।

ফণী একবার মণির দিকে চাহিয়া বলিল—"অনেক দিন তোমার গান শুনিনি মণি। একটী গান গাও তো, ভাই।"

সেই ঘরেই হারমনিয়ম ছিল। মণি হারমনিয়মের কাছে গিয়া একটি ইমনের সুর বাজাইল। তারপর শারোদোৎসবের একটি গান ধরিল। মিষ্টকণ্ঠের সুন্দর গান সকলেরই বড় সুন্দর লাগিল।

ইহার পর মণির শেখান একটি গান শান্তি গাহিল। সেটি বাংলায় রচিত একটি স্তব।

মণি বলিল—"দাদা তুমি একটি স্বদেশী গান গাওনা।"

ফণী একটি গান মনে করিয়া হারমনিয়মের কাছে আসিল। গানের সুর বাজিতেই সবার বক্ষে রক্তধারা যেন দৃপ্ত গতিতে ছুটিল। ফণী গাহিল—

ধন-ধান্য-পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা!

যাহাকে ছোট করিয়া দেখিয়াছি তাহাকে কত বড় মনে করা যায়, যাহাকে তুচ্ছ করিয়াছি তাহা কত মহৎ হইতে পারে, মেঘের রং, গাছের ডাল, পাখীর ডাক, মাঠের ঘাস ও কঠিন পাহাড় এ সমস্ত এক মুহূর্ত্তে

কত প্রিয় ও বাঞ্ছিত হইতে পারে এ গানটি একটিবার শুনিলেই তাহা বুঝা যায়।

মণি দাদার এই গান উৎকর্ণ হইয়া একাগ্রচিত্তে শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। গান শেষ হইয়া গেল, সকলে অন্যদিকে মন দিল, তখনও মণি একদৃষ্টে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। ফণী জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন গান মণি ?"

মণি চমকিয়া উঠিল। এতই একমনে সে গানের কথা ভাবিতেছিল যে চট্ করিয়া মণি কোন উত্তর দিতে পারিল না। দ্বিতীয়বার ঐকথা দাদা জিজ্ঞাসা করাতে মণি ধীরে ধীরে বলিল—"খুব সুন্দর দাদা! এ গানটা আমায় শিখিয়ে দাও দাদা!"

ফণী বলিল—"বেশ তো, শেখো।" মণি উৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইল। সুরেশবাবু কাছে ছিলেন বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলেন—গান শুনিতে শুনিতে মণির চোখে ২।৩বার জল আসিয়াছিল।

৯

আহারাদি শেষ করিয়া উষা যখন ঘরে আসিল, তখন খুব বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। ধারা খুব জোরে না হইলেও বর্ষণের একটি অবিশ্রান্ত শব্দ ঘরের ভিতর আসিয়া ভিতরকার ঈষত্তপ্ত ও কোমল শয্যা এবং শান্ত-নিস্তব্ধতাকে মনোরম ও লোভনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। বাহিরে গাঢ় অন্ধকার, আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুৎ ছুটিতেছিল। পরক্ষণেই গুরু গুরু মেঘ গর্জ্জন শুনা যাইতেছিল। বাতাস ক্ষণে ক্ষণে উদ্দাম হইয়া দ্বার ও বাতায়ন পথে আর্ত্ত পথিকের মতো যেন করাঘাত করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা জানাইয়া যাইতেছে।

পিছনের দিকে একটি উজ্জ্বল আলোক রাখিয়া একখানি ইজি চেয়ারে বসিয়া ফণীন্দ্র পড়িতেছিল। পালঙ্কের একধারে তাহাদের শিশু-পুত্র তপ্ত কোমল শয্যায় নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যাইতেছিল। উষা ঘরে প্রবেশ করিতেই ফণীন্দ্র বইখানি আঙ্গুল দিয়া বন্ধ করিয়া মিষ্ট হাসিয়া বলিল "এস।"

উষার পরনে মেঘরঙের একখানি শাড়ী, হাতে সুপরিষ্কৃত একটি বাটিতে খোকার জন্য দুধ।

দুধের বাটিটি একটি টিপায়ের উপর রাখিয়া উষা বলিল—"এখনও ঘুমাওনি।"

ফণী হাসিয়া বলিল—"এত দূরদেশ থেকে আমি বুঝি ঘুমুতে এসেছি!"

উষা মৃদু হাসিয়া বলিল—"পড়্‌তে এসেছ বুঝি?"

"এই যে পড়া রইল এখন বিছানায় তোলা। ঘরে সিকে থাক্‌লে সিকেয় রাখ্‌তাম।"

বলিয়া বইখানি পাশের পালঙ্কের উপর রাখিয়া ফণীন্দ্র হাসিয়া উঠিল ও উষাকে ধরিয়া পাশের চেয়ারখানিতে বসাইল।

"তারপর খবর কি বল?" ফণীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল।

"তা ভাল! তুমি কি মক্কেল পেলে নাকি?"

"মক্কেল তো বটে। একেবারে সেরা মক্কেল যার কাছ থেকে মকদ্দমা না পেলে প্রাণ বাঁচান দায় হয়ে ওঠে।" বলিয়া ফণীন্দ্র সস্নেহে উষার দক্ষিণ হাতখানি আপনার হাতের মধ্যে টানিয়া লইল।

উষা জিজ্ঞাসা করিল—"আমার চিঠি পেয়েছিলে?"

—হাঁ।

—উত্তর দিলে না যে?

—উত্তর দিলে আজ চিঠি এখনও চুয়াডাঙ্গায় থাক্‌ত। কাল দু'জনে

একসঙ্গে পড়তে পেতাম বটে! আচ্ছা মা আমার চিঠি পেয়ে রাগ করেননি ?

—না।

—তুমি রাগ করনি ?

—না।

—আচ্ছা তুমি সত্যি বলত, তোমাকে যদি কল্‌কাতা নিয়ে যাই এখানকার জন্য মন কেমন করে না ?

—করে।

—কার জন্যে ?

—মা, বাবা, ঠাকুরপো, আর আজকাল আর একজন হয়েছে—ইন্দু।

—ইন্দু বুঝি তোমার কাছেই বেশী থাকে ?

—হ্যাঁ খুব বেশী। সে আমায় সত্যি ভালবাসে।

—আচ্ছা, এখানে থাক্‌লে কারুর জন্য মন কেমন করে ?

—জানিনে।

—বলনা !

—তোমার কি মনে হয় ?

—আমি জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। উত্তরের পালা তোমার।

—তুমি তো জান।

—তবু বলনা। একটীবার শুনি।

—করে।

—মুখ নীচু কল্লে যে ? রাগ হল ?

—জিজ্ঞাসা কল্লে মনে হয়, তুমি বিশ্বাস করনা বা জাননা তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছ।

"—না তা নয়। সে গানটী তোমার ভাল লাগে বেশী, শোনা গান

হলেও কি তুমি সে গান শুনতে চাও না আর? আমারও মনে এক এক সময় বড় কষ্ট হয়। কিন্তু এইটুকু ভেবে আমার সে কষ্ট দূর হয় যে—তুমি হয়ত যে সময়ে আমার কথা ভাব্‌ছ, আমিও সেই সময়ে তোমাকেই মনে করছি। দু'জনের সত্যিকার মিলন হচ্ছে। তোমার ব্যবহারে মা বাপ বড় সুখে আছেন এ সব ভাবলে আমার বড় তৃপ্তি হয়। তারপর যখন তোমার কাছে আস্‌ব ভাবি, সেদিন থেকে আনন্দের সুরু হয়। আর আজকের আনন্দের তো তুলনাই নেই!"

বলিয়া ফণীন্দ্র ঊষার হাতখানি আপনার কোলের উপর রাখিয়া প্রকৃত ভালবাসার স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ঊষার পানে চাহিল।

একবার খানিকক্ষণের জন্য মেঘ ডাকিল। বাদল রাতের মেঘের সেই গুরু গুরু গর্জ্জন যেন দুইজনকে আরও নিকটে আহ্বান করিল। ফণীন্দ্র উঠিয়া ঊষাকে আপনার পাশে দাঁড় করাইল। বাঁ হাত দিয়া তাহাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া বলিল—"চল বাইরে একটু দেখে আসি।"

ঊষার আয়ত চোখ দু'টী আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠিল। আলিঙ্গন বদ্ধ হয়ে দুইজনে অতি তৃপ্ত হৃদয়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুধু জলের ধারার শব্দ। ঘরের ছাদের উপর গাছপালার উপর ঘাসের উপর, সুধু মাটীর উপর অবিশ্রান্ত জলের ধারা পড়িতেছে, সম্মুখে মুক্ত প্রান্তরের দিকে চাহিলে যেন মনে হয় এই বৃষ্টিধারার মধ্যে আকাশ ধরণীর মিলন হইয়াছে। বিদ্যুতের প্রভায় গাছের পাতায়, ঘাসের মাথায় সেই মিলনানন্দের শিহরণ যেন ক্ষণে ক্ষণে ফুলিয়া উঠিতেছে, আর বিশ্বের নরনারীকে মিলনাকাঙ্ক্ষায় অধীর করিয়া তুলিতেছে। তাই বুঝি এই বর্ষা-রজনীতে প্রিয়ের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়াও নরনারীর প্রাণ বিরহে ব্যাকুল হইয়া উঠে!

বর্ষণের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া দুইজনে পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল।

১০

সুরেশবাবু সকালে ডাকের চিঠিপত্র সমস্ত পড়িয়া বাড়ীর ভিতর আসিয়া বলিলেন—"আজ একটা সুখবর আছে।"

সুশীলাসুন্দরী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ?"

একটা ভালো জায়গায় বদ্‌লি হয়েছি।

বদ্‌লি ? কোথায় ?

রাণাঘাটে।

তা বেশ হয়েছে। তুমি বল্‌তে না যে রাণাঘাটের মতো জায়গায় চাকরি করে' সুখ আছে ?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। জায়গা তত বড় নয়, কিন্তু সব সুবিধা আছে। S. D. O. দের বরাত ভাল হলে ও জায়গাটা পায়। আমার পক্ষে সব চেয়ে ভাল এইজন্য যে ফণী ইচ্ছামত সহজে কল্‌কাতা থেকে যেতে আস্‌তে পারবে।

ক্রমশঃ কথাটা সকলের কানে উঠিল। উষা ফণীন্দ্রকে বলিল—"এবার বেশ হবে ; শনিবারে শনিবারে তো আসতে হবেই। তা ছাড়া মাঝে ছুটি পেলেও না এলে ছাড়ছিনে !"

ফণী হাসিয়া বলিল—"কাঙাল ভাত খাবি না,—হাত ধোব কোথায় ? এ সব কি আর তোমাকে বলে দিতে হবে ? কল্‌কাতা থেকে মাত্র এক ঘণ্টার পথ। দরকার হলে সন্ধ্যায় এসে সকালে ফেরা যাবে।"

উষা মনে মনে প্রীত হইয়া বলিল—"কত আস দেখা যাবে !"

তাহার পরদিনই সুরেশবাবুর বিদায়োপলক্ষে সভা হইল। সুরেশবাবু

তাঁহার সদয় ব্যবহার, নিরহঙ্কার কথাবার্তা, দেশের অসুবিধা দূর করিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা ইত্যাদি সদ্‌গুণের জন্য সকলেরই প্রিয় ছিলেন। শাস্তিবিধান বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সাবধান ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন। বেশী শাস্তি দিয়া তিনি নাম কিনিতে বা উন্নতির পথ সুগম করিতে কোন দিন চাহেন নাই। কর্ত্তব্যপালনই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। কর্ত্তৃপক্ষের সন্তোষ বিধানের জন্য কখন আপনার বিবেকের বিরুদ্ধে তিনি কার্য্য করিতেন না।

মেহেরপুরে জনকয়েক সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় বিদায়োপলক্ষে একটি গান ও একটি কবিতা রচিত হইয়াছিল। গানটির ভাষা এমনই সুন্দর করুণ হইয়াছিল এবং যে গাইয়াছিল সে বার বৎসরের বালকের কণ্ঠস্বর এতই মধুর ছিল যে, গানের সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই মনে হইল যে, একজন অতি নিকট আত্মীয়, একজন সত্যকার হিতৈষী আজ তাঁহাদের ছাড়িয়া যাইবেন। কাহারও কাহারও চোখে জল পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। সুরেশবাবু বড় কোমল প্রকৃতির লোক। গান শুনিয়া তাঁহারও চক্ষু সজল হইয়াছিল।

জানি এ চোখের জল একটা সাময়িক উত্তেজনার ফল মাত্র, জানি আর মাস কয়েক পরে এ সমস্ত হয়ত গল্পকথায় পর্য্যবসিত হইবে—তবু মনে হয় ইহারও প্রয়োজন আছে। এই আমাদের খণ্ডজীবনগুলি যদি নিরর্থক হয়, ইহার জন্য কাহার মনে যদি কোথাও একটা দাগ পর্য্যন্ত না পড়ে, তাহা হইলে এই সব খণ্ডজীবনের সমষ্টি আমাদের পরিপূর্ণ জীবন ফেলিয়া যাইবার সময়েও তো কাহারও চোখে জল দেখিতে পাইব না, কাহারও বুকে সেদিন কোন ব্যথা বাজিবে না। আর অপরের সেই অশ্রুবিন্দুর অভাবে সেই ক্ষণেকের বেদনা বোধ না জানিলে সমস্ত জীবনই যে ব্যর্থ বলিয়া মনে হইবে।

একজন একটি কবিতা পড়িলেন। কবিতাটি তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্য

লইয়া রচিত—একটি গাথার মতো। 'মমতা' প্রাণ দিয়া সব জীবের বিচার, কারাগারে তাহার মৃত্যু,—স্ত্রীর আত্মহত্যা, নিরাশ্রয় কন্যাকে আশ্রয় দান ও কন্যাবৎ পালন—এই সমস্ত শত মিষ্ট ভাষায় তাহাতে বর্ণিত হইয়াছিল।

তারপর প্রথামত এক এক করিয়া অনেকে বক্তৃতা করিলেন। গানের যে করুণ প্রভাবটুকু হইয়াছিল বক্তৃতার দ্বারা তাহার অনেকখানি হ্রাস হইয়া গেল। তারপর সুরেশবাবু উঠিয়া এই সমস্ত আয়োজন ও সম্মান দানের জন্য সমবেত সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তিনি যাহা করিয়াছেন সবই তাঁদের কর্ত্তব্য ; একটুও বেশী তিনি করেন নাই ; আরও বেশী করা তাঁহার উচিত ছিল, হয়ত করিবার ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু সে ইচ্ছা সফল হয় নাই। এই সমস্ত অবশ্য বক্তব্য কথাগুলি ধীরে ধীরে এমনভাবে বলিলেন যে, সকলেরই মনে হইল, কথাগুলি তিনি হৃদয় দিয়া বলিতেছেন। তারপর গানের সঙ্গে সভার কার্য্য শেষ হইল। সকলে জলযোগ করিয়া আপনার গৃহে ফিরিলেন।

একদিন নূতন S. D. O. আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল সকলে একসঙ্গে মেহেরপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিবেন এবং সেখানে সপ্তাহ খানেক থাকিয়া রাণাঘাটে আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

অনেক দুস্থ পরিবারকে সুশীলাসুন্দরী গোপনে সাহায্য করিতেন, যাইবার দিন সেই সব অনাথা ছাত্র—স্বামী-পুত্রহীন বিধবা সজল চক্ষে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের সকলকে সুশীলাদেবী মিষ্ট কথায় শান্ত করিলেন।

তারপর তাদের অশ্রুজলের উপর দিয়া তিন বৎসরের বাসস্থান ত্যাগ করিয়া সকলে যাত্রা করিলেন।

চূর্ণি নদীর জল খুব বাড়িয়াছে।

ফেরীঘাটে নদীর দুই পারে পাকা রাস্তার অনেক দূর পর্যন্ত জল গিয়াছে। রাণাঘাট স্কুলের পশ্চিম দিকের প্রাচীরের হাত দুই নীচে জল পৌঁছিয়াছে। বেলা দু'টা বাজিয়া গিয়াছে। স্কুলের কাছেই নদীর ধারে বটগাছের আড়ালে দুইটি ছেলে ক্লাশ হইতে পলাইয়া ঘণ্টা অবসানের অপেক্ষা করিতেছে।

শান্তিপুরের দিক হইতে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া আসিয়া নূতন S. D. O. খেয়ার নৌকায় পার হইয়া স্কুলের ঘাটে নামিলেন। যে ছেলে দু'টী ক্লাশ পলাইয়া নদীয় ধারে বসিয়াছিল, তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কোন ক্লাশে পড় ?"

একজন উত্তর করিল—"Fifth class."

আর তুমি ?

অপর ছাত্রটি বলিল—"Third class."

তোমরা এখন পড়া ছেড়ে এখানে কেন ?

ছেলে দু'টি কোন উত্তর করিল না।

এ ঘণ্টার পড়া করনি বুঝি ?

থার্ড ক্লাশের ছেলেটি বলিল—"কেন করব না আমরা। আমাদের এখন ছুটি।"

"এখন কিসের ছুটি বাপু ? সকলের এখন ক্লাশ হচ্ছে, আর তোমাদের দু'জনের ছুটি! চলত আমার সঙ্গে তোমাদের হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের কাছে!

ছেলে দু'টি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

থার্ড ক্লাশের ছেলেটি বলিল—"হেড মাষ্টারের কাছে যেতে যাব কেন? আমরা নিজেদের ক্লাশে যাব। চল্ তো রে।"

ছেলে দু'টি উঠিয়া স্কুলের ভিতর প্রবেশ করিল। পশ্চাৎ পশ্চাৎ S. D. O. আসিলেন।

হেড মাষ্টার মহাশয় তখন অফিসেই ছিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনার পরিচয় দিয়া বলিলেন—"আমি এক সময়ে এই স্কুলের ছাত্র ছিলাম। এই স্কুল থেকে এনট্রান্স পাশ করি।"

তাই নাকি? আপনি কি সূত্রে এখানে ছিলেন?

বাবা এখানের মুন্সেফ ছিলেন।

ওঃ! তখন হেড মাষ্টার ছিলেন কে?

ভোলানাথবাবু।

ভোলানাথবাবুর পরেই আমি এসেছি।

সেই থেকে আপনি এখানে আছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার ৩৩ বৎসর হ'ল এখানে।

তা হলে তো অনেকদিন আছেন! এখন তো পেন্সন্ পাওয়ার কথা!

হ্যাঁ। পেন্সনের কথা আর বলবেন না। এখন যে ক'টা দিন বাঁচি—অন্ততঃ যতদিন চাকরী কর্‌তে পারি—সে ক'দিন চাকরী করতে দিলে বাঁচি!

তার মানে?

দুঃখের কথা বল্‌ব কি, এখন কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য জ্ঞান হয়েছে!

Wohey বলেছিলেন না If I had served God as I have served king he could not have left me in my old age? Private স্কুলের দশাই এই!

এ বড় দুঃখের কথা। আপনার খুব সুনাম শুনেছি। তার ওপর

এতদিনকার কাজ আপনার। একটা কৃতজ্ঞতা তো আছে! হ্যাঁ, ভাল কথা—হিরু বলে স্কুলের যে চাকর ছিল, সে আছে?

আজ্ঞে না সে মারা গেছে—তিন বৎসর হল। আজকাল তার ভাগনেই কাজ কর্‌ছে। হিরু অনেক কাল স্কুলে কাটিয়ে গেছে।

হ্যাঁ, স্কুলটাকে সে একেবারে নিজের জিনিস বলে মনে কর্‌ত। তার একটা গরু ছিল সেও বোধ হয় ভাব্‌ত, স্কুলে তার একটা স্বত্ব আছে। গরুটা কাগজ পর্য্যন্ত খেত। জানালার কাছে দাঁড়ালে দুই একখানা কাগজ না খেয়ে নড়ত না!

তারপর দুই জনে স্কুলের আয় ব্যয় অন্যান্য অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল।

S. D. O বলিলেন—"একবার যদি অনুমতি করেন স্কুলটা তবে ভাল করে দেখে নিই।"

হেডমাষ্টার উঠিয়া বলিলেন—"বেশ ত দেখুন না!"

হেডমাষ্টার S. D. O কে সঙ্গে লইয়া স্কুলের চারিধার ঘুরিয়া আসিলেন

S. D. O বলিলেন—"এখন আর সে স্কুল বলে চেনা যায় না। অনেক বদ্‌লে গেছে!"

আজ্ঞে হ্যাঁ, সে আজ কত কালকার কথা!

দু'জনে আবার অফিসে আসিয়া বসিলেন।

S. D. O বলিলেন—"আমার একটী ছেলেকে আপনার কাছে দিয়েছি। তার দিকে একটু দয়া করে লক্ষ্য রাখবেন।"

মণীন্দ্রের কথা বলছিলেন! নিশ্চয়ই রাখব। চমৎকার ছেলেটি! যেমন বুদ্ধিমান আর তেমনি বিনয়ী ও পরোপকারী। একটু খাট্‌লেই compete কর্‌তে পারবে।

আপনাদের আশীর্ব্বাদ !

আর একটু পরে S. D. O উঠিলেন। হেডমাষ্টার রাস্তা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিলেন।

"একদিন পায়ের ধূলো দেবেন বাসায়" S. D. O সবিনয়ে বলিলেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব।

S. D. O চলিয়া গেলেন। হেড মাষ্টার ভাবিতে ভাবিতে ফিরিলেন S. D. O র স্বভাব বড় মধুর। এরূপ S. D. O আজকাল বিরল।

বলা বাহুল্য ইনি মেহেরপুরের সুরেশবাবু—রাণাঘাটে আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

১২

দেড় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মণীন্দ্র এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবে। আজ কলিকাতা যাত্রা করিবে। দুই দিন পরে পরীক্ষা আরম্ভ।

সকাল ৭টা বাজে। বাসার সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। ৮টার কিছু পূর্ব্বে কলিকাতা যাইবার একটী ট্রেণ ছাড়িবে। মণীন্দ্র সেই গাড়ীতে যাইবে। শনিবারে ফণীন্দ্র বাড়ী আসিয়াছিল। আজ সোমবার ; দুই ভাই একসঙ্গে যাইতেছে।

কেহ কোথায়ও যাইবার সময় সুশীলাসুন্দরী তাহাকে না খাওয়াইয়া বাড়ীর বাহির হইতে দেন না ইহাই তাঁহার চিরকালকার অভ্যাস। তাঁহার বিশ্বাস অনাহারে যাওয়া অন্যায়।

চাকর বামন উঠিবার আগে শাশুড়ি ও বধূ শেষ রাত্রে উঠিয়া সব কাজ শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন। মায়ের সম্মুখে বসিয়া দুই ভাই খাইয়া লইল।

জিনিসপত্র যাহা লইয়া যাওয়া হইবে, সব পূর্ব্বেই গাড়ীতে তোলা হইয়াছিল মণীন্দ্র প্রস্তুত হইয়া পিতা মাতা ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়াকে একে একে প্রণাম করিল। ইন্দু ও শান্তির সহিত কথা কহিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র সরোজকে আদর করিয়া গাড়ীতে উঠিল।

সুশীলাসুন্দরী প্রণতঃ পুত্রের চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিবার সময়ে বিমল আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন আর ভাবিয়াছিলেন এমন সুন্দর সুশীল পুত্র, সকলেই প্রশংসা করে, বিদ্যা ব্যবহার ব্যায়ামাদি ক্রীড়া সব বিষয়ে সকলের অগ্রগণ্য—এমন সন্তানের মুখ পানে চাহিয়া কোন্ মায়ের হৃদয় না আনন্দ ও গর্ব্বে পরিপূর্ণ হয় ?

মণীন্দ্রের চিত্তও নানা ভাবে নানা সুরে পূর্ণ হইয়াছিল বিশ্ববিদ্যার সিংহদ্বারে সে আজ অগ্রসর হইতেছে। সেখানে প্রবেশের অনুমতি পাইলে সেই প্রাসাদের অভ্যন্তরে কত কীর্ত্তি, কত সৌন্দর্য্য, কত শিল্প প্রত্যক্ষ করিবে। দেশবিদেশের কত জ্ঞান আহরণ করিবে, কাব্য সাহিত্যের মণি মুকুতা উন্মুক্ত করিয়া রত্নরাজি গ্রহণ করিবে। আর এ যাত্রা যেন তাহারি সূচনা। আনন্দ ও দোষহীন গর্ব্বে তাহার অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিল।

গাড়ী চলিয়া গেল। সুশীলাসুন্দরী সব কাজ ফেলিয়া পুত্রের মঙ্গল ও অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য একমনে দেবতার নাম জপ করিতে লাগিলেন।

মণীন্দ্র সিদ্ধি লাভ করিয়া নিরাপদে ফিরিয়া আসুক। বিজয়ের আনন্দ তাহার সুন্দর মুখে নূতন সৌন্দর্য্য আনিয়া দিক্, সে দেশের ও দশের সেবা করিয়া দেশের গৌরবস্থল হোক্, সুশীলাসুন্দরী একান্তমনে সেই কামনাই করিতে লাগিলেন।

মায়ের এই নীরব নিয়ত প্রার্থনা সন্তানের চিরদিনকার রক্ষাকবচ ও শত সুখ সৌভাগ্যের মূল

সশব্দে সেনেট হাউসের ঘণ্টা বাজিল। বুঝি তার চেয়েও জোরে পরীক্ষার্থীদের বুকের মধ্যে শব্দ হইতে লাগিল। ঢং! ঢং! ঢং! ঢং! সে শব্দে যেন বিন্দুমাত্র স্নেহ কি মমতা নাই—আছে শুধু কর্ম্মের আহ্বান। শব্দ যেন ডাকিয়া বলিল—ছুটিয়া আয়, নয়ত এখনি দুয়ার বন্ধ করিয়া দিব।

পুত্র পিতার সহিত কথা কহিতেছিল, সে চমকিয়া কথা বন্ধ করিল। সহপাঠী সহপাঠীর সহিত পাঠের আলোচনা করিতেছিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে সে আলোচনা ত্যাগ করিল। অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ছাত্র কোন বইয়ের পাতা উল্‌টাইতেছিল, ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ মাত্র সে তৎক্ষণাৎ বই বন্ধ করিয়া সেনেটের সম্মুখে সেই প্রস্তর মূর্ত্তির পদতলে বই ছুড়িয়া ফেলিল। তারপর সকলে পশ্চাতের দিকে না চাহিয়া ব্যগ্রহৃদয়ে দ্রুতপদে পরীক্ষা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মণীন্দ্রও ইহাদের সঙ্গে পরীক্ষা দিতে আসিয়াছে।

আজ ১লা মার্চ্চ। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার প্রথম দিন। সম্মুখে এক একটি উঁচু ডেস্ক লইয়া টুলের উপর এক একটি ছাত্র বসিয়া গিয়াছে। সম্মুখে পাশে পিছনে মনীষিগণের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তৈল চিত্র, কোথাও বা প্রস্তর মূর্ত্তি সেনেট হলের প্রভাব ও সম্মান বৃদ্ধি করিতেছে। যাহারা আজ এইখানে বসিয়া পরীক্ষা দিতেছে তাহাদের পূর্ব্বে ওইখানে বসিয়া কত ছাত্র পরীক্ষা দিয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে কতজনের গর্ব্ব গরিমায় বঙ্গদেশকে জগতের কাছে প্রসিদ্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহাদের পরেও কতজন এই খানে বসিবে যাহারা এখনও হয়ত মায়ের কোলে ধরণীর বুকে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে।

প্রশ্ন পত্র দেওয়া আরম্ভ হইল। সকলে আবেগপূর্ণ হৃদয়ে প্রশ্ন পত্র গ্রহণ করিল। কেহ কেহ তাহারি মধ্যে চক্ষু মুদিয়া একবার ভগবানকে স্মরণ করিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিল, যেন প্রশ্নগুলি সব তাহাদের জানা হয়।

আজ ইংরাজীর পরীক্ষা। প্রথম খণ্ডে ইংরাজী অনুবাদ ও ইংরাজী রচনার প্রশ্ন। অখণ্ড মনোযোগের সহিত সকলে প্রশ্ন পত্র পড়িতে লাগিল। পড়া শেষ হইলে কত চক্ষে উৎসাহের দীপ জ্বলিয়া উঠিল। কত চক্ষে তাহা নিভিয়া গেল। সকলে লিখিতে আরম্ভ করিল। স্বধু কাগজের উপর লেখনী চালনার শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। গার্ডরা আপন আপন সারির মধ্যে হলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পাদচারণা করিতে লাগিল।

তিন ঘণ্টার পর প্রথমার্দ্ধ পরীক্ষা শেষ হইল। সশব্দে ঘণ্টা বাজিল। সম্মুখে ডেস্কের উপর উত্তরের খাতা রাখিয়া দিয়া ছাত্রেরা একে একে বাহির হইয়া গেল। তাহারা বাহিরে আসিবামাত্র নানা কলরবে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল।

হ্যাঁরে উদার-হৃদয়! কি লিখেছিস্?

High souled.

আমি লিখেছি Noble hearted; ভুল হবে নাত?

ভুল কেন হতে যাবে! তুই কি লিখেছিস রে গোবিন্দ?

Liberal hearted.

First boy কি না তাই তোর একটু আলাদা লিখ্‌তে হয়।

Essay কোনটা লিখেছিস্ ভাই?

Politeness.

আমি Choice of Profession লিখেছি। প্রথমটা কিন্তু সহজ ছিল।

আরে, সহজ আর শক্ত। সান্যালের Essay বই থেকে সমস্ত ছাঁকা বসিয়ে দিয়েছি। একটী অক্ষর আর কাটতে হচ্ছে না; একেবারে P. R. S. এর লেখা।

তবেই মরেছিস তুই। দেখিস নি, Candidates are required to answer in their own words as far as practicable—লেখা আছে! এই বুঝি তোর own words হ'ল ?

কি হে মণীন্দ্র তুমি কি করেছ ?

আমি নিজের ইংরাজীতে যা পারি লিখেছি।

আমি বাবা চালাক ছেলে আছি। হেড্ মাষ্টারের লেখা Essay একেবারে উগ্‌রে দিয়ে এসেছি। কান ধর্‌ব আর ১৫ নম্বরের মধ্যে ১২ নম্বর আদায় কর্‌ব।

কিন্তু শালা কি lengthy paper করেছে ? Translation দিয়েছে একবার এক গঙ্গা !

ছিঃ গালাগালি দিতে আছে! এই বুঝি বিদ্যে হচ্ছে ?

এই রকম নানা কলরব করিতে করিতে ছেলেরা গোলদীঘির চারি ধার পূর্ণ করিয়া ফেলিল।

মণীন্দ্র গোলদীঘির সম্মুখেই দাদাকে দেখিতে পাইল। সে প্রফুল্ল মুখে বলিল, "বেশ কোশ্চেন পড়েছিল দাদা। ভাল হয়েছে।"

ফণীন্দ্র আনন্দ প্রকাশ করিয়া মণীন্দ্রকে লইয়া গোলদীঘিতে আসিল। সেখানে তখন প্রায় মেলা বসিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে খাবারওয়ালারা দোকান পাতিয়া বসিয়াছে, সরবৎ বিক্রেতা, নানাবিধ ভাজার পসরা—কিছুরই অভাব নাই। পরীক্ষার্থীরা কেহ ঘাসের উপর বসিয়াছে। কেহ সেখানে পূর্ব্ব হইতে রচিত শয্যায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে, কেহ বা দীঘির চারিদিকে ঘুরিতেছে।

একটী পরীক্ষার্থী বোধ হয় জমীদারের পুত্র হইবে—ঘাসের উপর বেশ পুরু বিছানা করিয়া আধশোয়া অবস্থায় আরাম করিতেছে। তাহার সম্মুখে একখানা ইংরাজী Grammar খোলা আছে। একটি প্রৌঢ় লোক—বোধহয় খানসামা—দিব্য করিয়া কলিকায় তামাক সাজাইয়া গড়গড়ার উপর বসাইয়া নলটি তাহার হাতে দিল। যুবক তিন ঘণ্টা পরে তামাকু পাইয়া পরম আনন্দে টানিতে লাগিল।

ছাত্রটির বয়স দেখিলে ২৫এর বেশী বলিয়াই মনে হয়। মণীন্দ্র ম্যাট্রিকুলেশনএর এত বড় ছাত্র কখন দেখে নাই। দাদাকে সে চুপি চুপি বলিল—"এতবড় ছেলে ফার্ষ্ট ক্লাশে পড়ত!"

ফণীন্দ্র হাসিয়া বলিল—"তাতে আর ক্ষতি কি! তবে বাবুটির তামাক খাবার বাহাদুরি আছে। সাম্‌নে একবারে ধূম্রলোক সৃষ্টি করে ফেলেছেন।"

ফণীন্দ্রের পাচক বাসা হইতে জলখাবার তৈয়ারি করিয়া আনিয়াছিল। ফণীন্দ্র মণিকে জলখাবার খাওয়াইল। জলযোগ করিয়া মণি ঘণ্টার অপেক্ষা করিতে লাগিল। ঘণ্টা বাজিতেই মণি সেনেটে প্রবেশ করিল; ফণী ফিরিয়া গেল।

এবার অপঠিত পুস্তক হইতে উদ্ধৃত গদ্য ও পদ্যের সারমর্ম্ম লেখা ও ব্যাকরণের প্রশ্নের উত্তর করিবার পালা।

৫টা বাজিতে পরীক্ষা শেষ হইল। মণীন্দ্র খুব ভাল উত্তর লিখিতে পারিয়াছিল। মনের আনন্দে সে বাসায় ফিরিল।

গল্প করিতে করিতে দুই ভ্রাতায় জলযোগ করিল। তারপর উভয়ে খানিকটা বেড়াইয়া সন্ধ্যার পরই বাসায় ফিরিল। ফণীন্দ্র ইচ্ছা করিয়াই মণীন্দ্রকে গান শুনাইল। গানের সুর তাহার মস্তিষ্ককে বেশ পরিস্কৃত করিয়া দিল। গান শুনিয়া মণীন্দ্র অঙ্ক ও জ্যামিতির বই লইয়া বসিল। ১০টা বাজিতে মণীন্দ্র দাদার কোলে শয়ন করিল।

ফুলের দল ধীরে ধীরে মুদিত হইয়া গেলে যেমন দেখায়, মণীন্দ্রের দেহটি তেমন মুদিয়া থাকিল। নিদ্রার মধ্যেও সেই পরীক্ষামন্দির, সেই প্রশ্নপত্র, গার্ডদের সেই নিঃশব্দ দ্রুত পদসঞ্চার, গোলদীঘির শান্ত ছবি একে একে সব যেন ছবির মতো ফুটিয়া উঠিল।

ক্রমে রাত্রি অবসান হইল; প্রভাতের আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সেই প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে মণীন্দ্র নূতন উৎসাহ লইয়া জাগিল।

১৪

দ্বিতীয় দিন গণিতের পরীক্ষার পর ছেলেরা বাহিরে আসিল। ফণীন্দ্র যথাসময়ে আসিয়া ভ্রাতার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল, মণীন্দ্র আসিলে তাহাকে সঙ্গে করিয়া গোলদীঘির ভিতর একটি গাছের তলায় আসিয়া বসিল, দাদার সহিত কথা কহিতে কহিতে জলযোগ করিতে লাগিল।

হাত মুখ ধুইয়া ও মুছিয়া মণীন্দ্র বলিল, "দাদা কাল থেকে তুমি আর এ সময় এসো না। কালীচরণ খাবার নিয়ে এলেই চল্‌বে।"

তোমার কোন অসুবিধে হবে না!

না!

বাসা চিনে যেতে পার্‌বে তো?

খুব পারবো।

আচ্ছা বেশ তাই করা যাবে। বরং পাঁচটার সময় আমি এখানে এসে থাক্‌ব, দু'জনে একসঙ্গে বাসায় ফির্‌ব।

কি দরকার তাতে? তুমি বরাবর বাসাতেই যেও। আমি একাই ফির্‌ব।

ফণীন্দ্রের সেদিন আর দেরী করিবার উপায় ছিল না ; তখনি চলিয়া গেল। পরীক্ষা পুনরায় আরম্ভ হইতে কএক মিনিট দেরী ছিল। ফণীন্দ্র এধার-ওধার বেড়াইতে লাগিল।

সেই জমীদার পুত্র ২৫ বৎসর বয়সের ছাত্রটী তেমনি করিয়া গড়গড়াতে তামাক খাইতেছিল। তাহার তখনও জলযোগ আরম্ভ হয় নাই! দুইজন লোক আহার্য্য যোগাড় করিতেছিল। একটি ভৃত্য, অপরটি বোধ হয় পাচক। ভৃত্যটি বড় একখানা ছুরি দিয়া অসময়ের আম ছাড়াইয়া একখানি রূপার থালায় রাখিল। কিস্‌মিস্ পেস্তা বাদাম দুই তিন মুঠা করিয়া সেই থালার বিভিন্ন স্থানে সাজাইল। গুটি দশেক চাটিম কলা তাহাদের আবরণ হইতে সদ্য মুক্তিলাভ করিয়া সেই থালার শোভা বৃদ্ধি করিল। থালায় যেটুকু স্থান অবশিষ্ট ছিল ৫টি বড় বড় সন্দেশ ও ৫টি রসোগোল্লা তাহা অধিকার করিয়া লইল।

থালাখানি তখন সযত্নে ও সমাদরে বাবুটির সম্মুখে রাখা হইল। ইহার পাশে পাচক অপর একখানা খাদ্যপূর্ণ থালা স্থাপিত করিল। এই দ্বিতীয় থালাখানিতে ছিল পাচকের হাতের তৈয়ারী ১৫ খানি লুচি ও ২।১ রকমের তরকারী। ছাত্ররূপী বাবুটি গড়গড়ার নল ফেলিয়া খাদ্যদ্রব্যে মনোনিবেশ করিল।

ক্ষিপ্রগতিতে অর্দ্ধেক সমাধা করিবার পর একটু অবসর পাইয়া বাবুটি চাহিয়া দেখিল খানিকটা দূরে এক অতি শীর্ণ ভিখারী দাঁড়াইয়া নির্ণিমেষ নয়নে তাহার আহারের ক্ষিপ্রগতি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিতেছে। আহার্য্যের একটা বৃহৎ গ্রাস মুখে পুরিয়া কিঞ্চিৎ অস্পষ্টস্বরে বাবুটী বলিল—"কিরে, কি দেখছিস্ এখানে হাঁ করে?"

শীর্ণ লোকটী একবার মুখনাড়িবার চেষ্টা করিয়া হাত পাতিল। পাশেই—একগাছি বাঁধান ছড়ি পড়িয়া ছিল, বাবুটি ভিখারীকে একটা গালি

দিয়া সেই ছড়ি তুলিয়া লইবামাত্র পরবর্ত্তী ব্যাপারটির আস্বাদ অনুমান করিয়াই ভিখারী পলায়ন তৎপর হইল। তাহার শীর্ণ দেহটাকে আঘাত হইতে বাঁচাইবার চেষ্টাটা এতই ক্ষিপ্রবেগে হইয়াছিল যে পড়িতে পড়িতে কোন রকমে সে বাঁচিয়া গেল। একটু দূরে যাইতেই ছড়ি গাছটি মাটিতে আঘাত করার শব্দ তাহার কানে আসিল।

বয়স্ক ছাত্রটির আহার মণীন্দ্রকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া অপরের খাওয়া—তাহা যতই মনোরম হউক না কেন—দেখা মোটেই ভাল দেখায় না। তাই কাছাকাছি এধার ওধার পাই-চারি করিতে করিতে সবখানি দেখিয়া লইতেছিল। ভিখারীর জন্য তাহার সত্যই দুঃখ হইতেছিল; কিন্তু তাহার কাছে তখন একটি পয়সাও ছিল না যাহা ভিখারীর হাতে দিয়া তাহার অন্ততঃ কিঞ্চিৎ জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারে। তাহার এতদিনকার অভ্যাস পয়সা কাছে না রাখা, মণীন্দ্র আজ অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া মনে করিল। নিতান্ত দুঃখের সহিত মণীন্দ্র সেস্থান হইতে সরিয়া গেল।

গোলদীঘির একেবারে পশ্চিম পাড়ে আসিয়া মণীন্দ্র আর একটি দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিল। সেই শীর্ণ ভিখারীর ক্ষুধিত দৃষ্টি মনে করিয়া যখন সে আবার সেই দিকে অগ্রসর হইবে ভাবিতেছিল, কে একজন পেছন হইতে বলিল, "আবার কেন মা! এত খানি বয়ে এ সব নিয়ে এলে!"

মণীন্দ্র সেই দিকে ফিরিয়া দেখিল অদূরে ঘাসের উপর মায়ের কাছে একটি ছেলে দাঁড়াইয়া। ছেলেটি মায়ের হাত হইতে ব্যস্ত হইয়া একটা রেকাবি ও একটি বাটি লইয়া সেই ঘাসের উপর রাখিল। অনুমানে মণীন্দ্র বুঝিল এ ছেলেটিও পরীক্ষার্থী। বোধ হয় দরিদ্র এবং সংসারে আর কেহ নাই তাই মা আপনি খাবার লইয়া আসিয়াছেন। মণীন্দ্রের কৌতূহল হইল, দেখে সে পাত্রে কি আছে। কিন্তু তাড়াতাড়ি আবার সেই দিকে ফিরিয়া

আসা অশোভন হইবে মনে করিয়া মণীন্দ্র কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া আবার সেই দিকে ফিরিল। ঠিক সেই স্থানটী অতিক্রম করিবার সময় মণীন্দ্র লক্ষ্য করিয়া দেখিল, পিত্তলের রেকাবিতে থান পাঁচ ছয় রুটী ও একটা তরকারী রহিয়াছে ; আর পাথরের বাটীতে আধ বাটী দুধ।

তাহাদের অতিক্রম করিয়া স্বল্প দূরে আসিতে মণীন্দ্র শুনিল, ছেলেটী বলিতেছে, "আবার দুধ কেন আনলে মা ? অসুখ থেকে উঠে তুমি একটু দুধ খেলে না আর—"

মা বাধা দিয়া বলিলেন—"তা হোক বাবা ! একজামিনের পড়া, তার উপর এত খাটুনি। পোয়াটেক দুধও যদি না খাবি তো কি খাবি বাবা।"

মণীন্দ্রের ইচ্ছা হইল সেই খানটিতে দাঁড়াইতে কিংবা বরং আরও খানিকটা পিছাইয়া মা ও ছেলের সমস্ত কথাবার্ত্তার প্রতি অক্ষরটি পর্য্যন্ত মন দিয়া শুনে। কিন্তু আবার এখনি ফিরিলে তাঁহারা কি ভাবিবেন ভাবিয়া সে আরও দূরে চলিয়া আসিল।

আরও খানিক আসিয়া মণীন্দ্র একবার পিছনের দিকে চাহিল। দেখিল সেই শীর্ণ ভিখারী প্রসাদ ভিখারী বুভুক্ষু কুকুরের মতো সেই আহারেরত ছেলেটির দিকে যাইতেছে। কি হয় দেখিবার জন্য মণীন্দ্র আবার সেই দিকে ফিরিল।

ভিখারী হাত যোড় করিয়া কি একটা কথা বলিয়াছে এমন সময় মণীন্দ্র সেখানে পৌঁছিল। যেন ভিখারীকে দেখিবার জন্যই সে ঐ খানে দাঁড়াইয়াছে এই ভাব দেখাইয়া মণীন্দ্র স্থির হইয়া সেখানে দাঁড়াইল ও সমস্ত লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল।

ছেলেটি দুধটুকু পান করিয়া একখানি রুটি ততক্ষণে উদরস্থ করিয়াছে।

ভিখারী কহিল, "দু'দিন খাইনি বাবু। কিছু খেতে দিয়ে প্রাণ বাঁচান।" বলিয়া ভিখারী সেখানে অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িল।

ছেলেটি স্তম্ভিত হইয়া ভিখারীর পানে একবার ভাল করিয়া চাহিল। পর মুহূর্ত্তে সেই রেকাবির অবশিষ্ট রুটি ও তরকারি ভিখারীর প্রসারিত হাতের উপর তুলিয়া দিল।

ভিখারীর চোখে ও মুখে একটা বিস্ময় আনন্দ ফুটিয়া উঠিল। কৃতজ্ঞ কুকুরের লাঙ্গুল সঞ্চালনের ন্যায় ভিখারী বার কয়েক ঘাড় নাড়িয়া একখানা রুটি একেবারে মুখের মধ্যে ঠেলিয়া দিল। বোধ হয় আধ মিনিটের মধ্যে তাহা উদরে পৌঁছিল। আর একখানি রুটিও ঐখানে গেল। ভিখারী তাকাইয়া দেখিল আর দুইখানি রুটী তখনও আছে। খাওয়া বন্ধ করিয়া সে তখন আপনার মলিন বস্ত্রাঞ্চলে রুটী দুইখানি বাঁধিয়া বলিল—"বুড়ীমা আছে, নড়তে পারে না ; তার জন্য একখানা থাক। বুড়ীরও অদেষ্টের দুঃখু তাই মরে না।" তারপর দীঘির পাড়ে আসিয়া দুই হাত অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া জল আকণ্ঠ পান করিয়া বাকী ক্ষুধাটুকু মিটাইল।

ছেলেটী যেন একটু অপরাধীর মতো মায়ের পানে চাহিয়া বলিল—"মা তুমি রাগ কল্লে—দিয়ে দিলাম বলে!"

অতি প্রসন্ন সুন্দর হাসি হাসিয়া মা বলিলেন—"না বাবা, তুমি ভালই করেছ।"

সেই কথা ও হাসির মধ্যে সর্ব্ব দুঃখ স্নেহ ও মমতা যেন ইন্দ্রধনুর বিভিন্ন বর্ণের মতো পাশাপাশি ফুটিয়াছিল।

মণীন্দ্র মা ও ছেলেকে বেশ করিয়া চিনিয়া রাখিল।

১৫

পরদিন প্রথমার্দ্ধ পরীক্ষার পর মণীন্দ্র দেখিল, যে ভিখারীকে তাহার আহার্য্য ধরিয়া দিয়াছিল, সে ছেলেটি সেই একই স্থানে বসিয়া আছে।

বাসা হইতে মণীন্দ্র খাবার আনিতে নিষেধ করিয়া আসিয়াছিল এবং পকেটে করিয়া একটি টাকা আনিয়াছিল। ছেলেটির সহিত পরিচয় করিতে মণীন্দ্র আজ কৃতসংকল্প হইয়াছিল। আজ আর তাই কাল বিলম্ব না করিয়া মণীন্দ্র একেবারে ছেলেটির কাছে আসিয়া ঘাটের উপর বসিয়া পড়িল। ছেলেটি একটু বিস্মিত হইয়া মণীন্দ্রের পানে চাহিল।

মণীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম কি ভাই ?

ছেলেটি মণীন্দ্রের দিকে ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল, শ্রীগৌরাঙ্গ গঙ্গোপাধ্যায়।

মণীন্দ্র ভাল করিয়া ছেলেটির পানে চাহিয়া দেখিল—গৌরাঙ্গ নামটি ছেলেটিকে মানায় বটে। অঙ্গের বর্ণ গৌর তো বটেই তেমন উজ্জ্বল গৌর অথচ স্নিগ্ধ বর্ণ নারীর মধ্যেও কদাচিৎ দেখা যায়। তাহার সেই চম্পক বর্ণ স্থানে স্থানে ছিন্ন মোটা কিন্তু পরিস্কৃত কালরংয়ের ছিটের কামিজের মধ্য দিয়া আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুৎ প্রভার মতো দেখাইতেছিল। তাহার দীর্ঘ ও কৃশ দেহ, মাথায় ছোট করিয়া ছাঁটা রেশমের মতো সূক্ষ্ম ও মসৃণ ঘন চুল। প্রশস্ত উন্নত ললাট, প্রশান্ত উজ্জ্বল চক্ষু, সূক্ষ্ম ও কথা কহিবার সময়ে কাঁপিয়া ওঠা ওষ্ঠাধর সমস্ত মিলিয়া তাহার আকৃতিকে একটি বিশিষ্টতা দান করিয়াছিল।

মণীন্দ্র বলিল—কাল তোমার খাবার খাওয়া ও ভিখারীকে খাবার

দেওয়া দুইই আমি দেখেছি ; ইচ্ছা হচ্ছিল আমিও ওর থেকে একটু নিই। তোমাকে এখন আলাপে 'তুমি' বলাতে রাগ কচ্ছনা তো ?

প্রথম প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া একটু লজ্জিত ভাবে গৌরাঙ্গ বলিল, যে, সে একটুও রাগ করে নাই।

আজ তোমার এখনও খাওয়া হয়নি ?

না।

আজও কি মা খাবার নিয়ে আসবেন ?

বোধ হয় আসবেন।

তোমার খিদে লাগেনি ?

না আমার ইস্কুলে কিছু খাওয়া অভ্যাস ছিল না। একেবারে ছুটির পর বাসায় এসে খেতাম। মাকে ত' বলেছিলাম। কিন্তু উনি তা শুনলেন না। মিছামিছি এই এতখানি পথ হাঁটা।

কোথায় তোমাদের বাসা ?

সুকিয়া ষ্ট্রীটে।

এখনও তো মা এলেন না। ততক্ষণ আমরা এক কাজ করি না কেন ?

কি কাজ ?

কিছু খাবার কিনে দু'জনে খাই। তারপর তোমার খাবার এলে আবার দু'জনে মিলে খাওয়া যাবে।

উত্তরে গৌরাঙ্গ কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় পূর্ব্বদিকের রাস্তায় দৃষ্টি পড়িতেই বলিয়া উঠিল, "মা আসছেন।"

সঙ্গে সঙ্গে গৌরাঙ্গ উঠিয়া গেল এবং একটু পরেই মায়ের হাত হইতে খাবার আপনার হাতে লইয়া মায়ের আগে আগে সেই স্থানে আসিল।

মণীন্দ্র উঠিয়া গৌরাঙ্গের মাকে প্রণাম করিল। তিনি মণীন্দ্রকে

আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে সেখানে বসিয়া পুত্রের হাত হইতে খাদ্যের পাত্র লইয়া মণীন্দ্রের পানে চাহিয়া বলিলেন—"তুমি যে কেন গৌরের খাবার ভাগ করে খাবে বলেছিলে বাবা তা আমি বুঝেছি।"

মণীন্দ্র কিছু বলিবার আগেই আবার তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন—"এখন তো এর খাবার এসেছে বাবা। এখনও কি এই মোটা রুটি ভাগ করে খাবার ই'চ্ছে আছে ?"

মণীন্দ্র বলিল—"তাহলে মা আপনি আমার খেতে চাইবার কারণ বুঝতে পারেন নি। এখানে তো কত ছেলে কত রকমই খাচ্ছে—লাখ্-পতি লোকের ছেলে থেকে গরীবদের ছেলে পর্য্যন্ত। কিন্তু এমন খাবার আর কারু ভাগ্যে জোটেনি। সেই লোভে এসেছিলাম। এসেছিলাম ঠিক হ'ল না এসেছি। এখন দিন আমাকে ভাগ।"

"বেশ খাও তো বাবা।" বলিয়া গৌরাঙ্গের মা খাবারের পাত্র সেখানে রাখিলেন। সেই খানপাঁচেক রুটি খানিকটা তরকারি এবং একটি বাটিতে পোয়াটেক দুধ।

কিন্তু দু'খানি পাত্রে যে ভাগ করিয়া দিবেন তাহারও উপায় নাই। গৌরাঙ্গের মাকে একটু ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া মণীন্দ্র বলিল, "মা, আমিও ব্রাহ্মণ। এক রেকাবিতে আমরা দু'জনেই খেতে পারি। নয় ত আমাকে ঐ গামছায় দিন আর গৌরাঙ্গের রুটি পাত্রেই থাক।"

প্রথমে একটু বিস্ময় পরে আনন্দ তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। তিনি গামছাখানি সেই ঘাসের উপর বিছাইয়া তাহার উপর খাবারের পাত্র রাখিয়া দিলেন। বলিলেন—"আমার ভুল হইয়াছিল বাবা, খাও।"

দু'জনে হাসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল।

গৌরাঙ্গের মা মণীন্দ্রের বাড়ী কোথায়, বাড়ীতে কে কে আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন। মণীন্দ্র খাইতে খাইতে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিল।

তাহার পিতা ডেপুটি ও ভ্রাতা উকিল এসব না বলিয়া সুধু বলিল যে, তাহার পিতা কার্য্যোপলক্ষ্যে রাণাঘাটে থাকেন এবং তাহার দাদা কলিকাতাতেই কাজ করেন।

দুই জনে ঠিক আধাআধি ভাগ করিয়া সব জিনিস খাইয়া লইল। সেজন্য শীঘ্রই খাবার উঠিয়া গেল।

গৌরাঙ্গ ও মণীন্দ্র পূর্ব্বদিকে ফুটপাথের কাছেই যে জলের কল ছিল, তাহার কাছে গিয়ে জল পান করিয়া লইল। পরে রাস্তা হইতে একমুঠা ধূলা লইয়া বাটি ও রেকাবটি মাজিয়া ও গামছাখানি কাচিয়া লইয়া পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিল।

আচ্ছা গৌর আমি তো তোমার অর্দ্ধেক খাবার খেয়ে ফেল্‌লাম। এবার তাহলে আমি কিছু খাবার নিয়ে আসি কিনে, দু'জনে খাওয়া যাবে।

গৌরাঙ্গ বলিল—আমার আর খিদে নেই। এখন আর খাবার কাজ নেই।

গৌরাঙ্গের মা বলিলেন—এখন সামান্য যা কিছু হোক পেটে পড়েছে; এখন থাক্।

কিন্তু মা আপনি আসবার আগেই যে আমরা ঠিক করে রেখেছিলাম, মা যে খাবার আনবেন আমরা দু'জনে খাব, আর কিছু খাবার কিনে দু'জনে খেয়ে নেব। বলিয়া মণীন্দ্র উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

গৌরাঙ্গের মা বলিলেন—"বাবা এখন যেও না, গৌর তো বাজারের খাবার খাবে না বাবা।"

কেন মা? আমি বেশ ভাল খাবার কিনে নিয়ে আসি দৌড়ে।

তিনি হাসিয়া বলিলেন—"না বাবা সে জন্য নয়। বাজারের খাবারে প্রায়ই বিলিতি চিনি বা বিলিতি নুন থাকে, সেজন্য গৌরাঙ্গের খেতে নেই।"

ওঃ! আচ্ছা আমি কিছু ফল কিনে নিয়ে আসি।" বলিয়া প্রতিবাদের সময় না দিয়া মণীন্দ্র তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

একটু পরে ৪টা কমলা নেবু ও কতকগুলি আকের টিক্‌লি আনিয়া বলিল—"এবার আর এতে তো বিলিতি কিছু নেই।"

দু'জনে তখন সেই আকের খণ্ডগুলি ও নেবু খাইয়া ফেলিল।

গৌরাঙ্গ বলিল—"মা এবার তুমি তাহলে যাও। আমাদেরও ঘণ্টা বাজবার সময় হ'ল।"

মা উঠিলেন। গৌরাঙ্গ মায়ের পায়ের ধূলা লইল। মণীন্দ্রও তাঁহাকে আর একবার প্রণাম করিয়া বলিল—"একদিন মা আপনাদের বাসায় গিয়ে খেয়ে আসব।"

তিনি হাসিমুখে দুইজনকেই আশীর্ব্বাদ করিলেন। পাত্র দু'খানি হাতে তুলিয়া লইয়া মণীন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যাবে বৈকি বাবা! তুমি যখন ধরা দিয়েছ তখন কি অল্পে ছাড়া পাবে!"

গামছায় বাঁধা পাত্র দুইটি হাতে করিয়া গৌরাঙ্গের মা সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। গৌরাঙ্গ মায়ের গতিশীল মূর্ত্তির দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। যখন আর দেখা গেল না একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "চল এবার ভিতরে যাই।"

উভয়ে দ্বারের কাছে পৌঁছিবার আগেই ঢং ঢং করিয়া সতর্ক করিবার ঘণ্টা বাজিয়া গেল।

১৬

পরীক্ষার কয়েক দিনে গৌরাঙ্গের সহিত মণীন্দ্রের বন্ধুত্ব হইয়া গেল। পরীক্ষা যে দিন শেষ হইল মণীন্দ্র গৌরাঙ্গকে বলিল—"আজ তোমাদের বাড়ী যাব।"

গৌরাঙ্গ বলিল—"বেশ। আমরা এত গরীব যে আমাদের বাসায় গেলে তোমার মনের ভাব কি রকম হবে বলতে পারিনি। তা ছাড়া তুমি যদিও নিজের কথা কিছু বলনি কিন্তু আমার বিশ্বাস তোমরা রীতিমত বড়লোক।"

"কিসে তোমার এ বিশ্বাস হ'ল?"—মণীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল।

তোমার চেহারা কথাবার্ত্তা সব ভাবেই তোমাকে বড়ঘরের ছেলে বলেই মনে হয়।

চেহারার কথা যদি বল, তাহলে বলি শোন—তুমি আর আমি যদি এক সঙ্গে থাকি আমাকে তোমার কর্ম্মচারী বা অনুচর বলে মনে হবে। আর কথাবার্ত্তাতেও আমি যে তোমাকে ছাড়িয়ে গেছি বলে কেউ মনে কর্‌বে না। আর আমার কথার প্রমাণের জন্য তোমার সাম্‌নে একখানা আয়না উপস্থিত কর্‌লেই হবে।

উভয়েই হাসিয়া উঠিল।

দু'জনেই এক সঙ্গেই বাহির হইল।

সুকিয়া ষ্ট্রীটে আসিয়া পূর্ব্বমুখে খানিকটা চলিয়া দুইজনে বাঁহাতে একটি সরু গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। গলিটা যেখানে শেষ হইয়াছে তাহার কাছাকাছি আসিতেই দেখা গেল, ডান হাতে কতকগুলি খোলার বাড়ী এবং ভিতরে যাইবার একটি দরজা। প্রবেশ পথে একটি লোক

তাহার দেহে ও কেরোসিন তৈলের একটী টিন রাখিয়া পথ রোধ করিয়া বসিয়াছিল। পিছন হইতে লোকটির কাপড় পরিবার ভঙ্গী, তাহার কানের উপরাংশের স্বর্ণালঙ্কার, পায়ের বলিষ্ঠ জুতা এবং কথাবার্ত্তার ভাষা হইতে তাহাকে পশ্চিম প্রদেশের লোক বলিয়া অনায়াসেই বুঝা যাইতেছিল। দরজার ভিতরের দিকে দণ্ডায়মান একটি ১০।১২ বছরের বালককে সে বলিতেছিল—"হমি ঔর এক পয়সাকে ভি তেল তোদের দেবে না। মাটিকা তেল মাংনি আসে, না ?"

ছেলেটি নিতান্ত কাতর হইয়া বলিল—"আজ তুমি এক বোতল তেল দিয়ে যাও। দু'দিন পরেই বাবা মাইনে পাবেন, পেলেই তোমার সব দাম শোধ করে দেব।"

"তোর বাপ তলব ত' পাবে, হমি দামও পাচ্ছে। হমার এক মাসের যাস্তি দাম পাওনা আছে, ঔর উধার হমি দিচ্ছে না, ঔর চারটে দিন হমি দেখবে তার বাদ্ নালিস করে দিয়ে এমনি করে কান পাকড়ে টাকা আদায় করে লিব।" বলিয়া লোকটা তাহার কঠিন স্থূল হাত দিয়া বালকের একটি কান ধরিয়া একটু নাড়িয়া দিল।

ঠিক সেই সময় গৌরাঙ্গ ও মণীন্দ্র দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তেলওয়ালা ইহাদের দেখিতে পায় নাই, কিন্তু ছেলেটি গৌরাঙ্গকে দেখিবামাত্র কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—"দেখদিকি গৌরাঙ্গদা তেলওয়ালা তেল ত দিলে না উল্‌টে আমার কানে হাত দিচ্ছে।"

বালক গৌরাঙ্গকে সম্বোধন করিয়া কাঁদিয়া ফেলিবামাত্র তেলওয়ালা বালকের কান ছাড়িয়া দিল।"

গৌরাঙ্গ ক্রুদ্ধভাবে বলিল—"কেন হে বাপু তুমি ওর কানে হাত দিয়েছ ? তেল বিক্রী করতে এসে এত আস্পর্দ্ধা তোমার।"

সহানুভূতি লাভ করিয়া বালকের ক্রন্দনের মাত্রা আরও

বাড়িয়া গেল। সে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল—"আমি এত করে বললুম, পরশু থেকে আমি তেল অভাবে পড়তে পাচ্ছি নে, আজকে দিয়ে যাও। তাইতে বাবাকে পর্য্যন্ত কি করে অপমান করলে!"

বালকের কান্না দেখিয়া মণীন্দ্র পর্য্যন্ত চটিয়া গেল। বলিল—"তোমার নালিশ করা আমরা বার কচ্ছি। ভাল লোকের ছেলের গায়ে হাত তোলার জন্য আমরা তোমার নামে নালিশ কচ্ছি। মজাটী তখন টের পাবে।"

তেলওয়ালা নরম কথা আরম্ভ করিল। কিন্তু ঐটুকু গোলমালেই দেখিতে দেখিতে এধার ওধার হইতে ১৫।১৬ জন লোক জমিয়া গেল, ব্যাপারটা কি জানিয়া লইল। কেহ বলিল—ছোট লোকের আস্পর্দ্ধাটা একবার দেখেছ? কেহ বলিল—দেয়া যাক্ বেটাকে বেশ করে চাঁটিতং করে।

একজন বলিল—শুধু ওরই দোষ দিলে হবে কেন? তেল কিনবার সখ আছে, দাম দিতে নারাজ হলে চলবে কেন?

তাই বলে ভদ্রলোকের ছেলের কানে হাত দেবে? তুমি যে একেবারে বিষ্ণুশর্ম্মা হয়ে উঠেছ দেখছি।

ইহাদের মধ্যে একটা লোক খুব নিবিষ্টচিত্তে সব কথাবার্ত্তা শুনিয়া যাইতেছিল। এবার সে ভিড়ের মধ্যে অগ্রসর হইয়া ছেলেটীর সম্মুখীন হইয়া বলিল—"খোকা নিয়ে এস তো তেলের বোতল। যাও নিয়ে এস।"

ছেলেটী লোকটির কথার ভাবে সত্যকার ভরসা পাইয়া ভিতরে গেল ও একটু পরেই বোতল লইয়া আসিল।

"দে শীগ্‌গির এতে তেল ভরে" লোকটী গম্ভীরস্বরে বলিল।

তাহার কথায় এমন একটু বিশেষত্ব ছিল যে, তেলওয়ালা বিনা বাক্যব্যয়ে বোতলে তেল ভরিয়া দিল।

"আর যদি কোন দিন ভদ্রলোকের ছেলের গায়ে হাত তুলবে তো এই রকম কান ধরে এর দশগুণ জোরে তোমায় চড় লাগাব" বলিয়া লোকটী তাহার পুষ্ট হাত দিয়া তেলওয়ালার একটা কান ধরিয়া অপর হাতের দ্বারা গালের কাছে একটা মাঝারি গোছের চড় দেখাইল।

কল্পিত চড়ের একটু প্রতিবাদ করিবামাত্র অনেকে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সে তখন বেগতিক দেখিয়া তেলের টীন উঠাইয়া লইয়া সেস্থান ত্যাগ করিল।

গৌরাঙ্গ ও মণীন্দ্র দুইজনে তখন বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

বাড়ীর ভিতর আসিয়া মণীন্দ্র দেখিল, বাহির হইতে সে বাড়ীটাকে যে রকম ভাবিয়াছিল, বাড়ীর মধ্যে তাহার চেয়ে অনেক বড়। উত্তর দক্ষিণ দুই দিকে সারি সারি ছোট ছোট ১২ খানি ঘর, পূর্ব্বদিকে ২ খানি ঘর, পশ্চিম দিকে প্রাচীর, কল ইত্যাদি, মাঝখানে উঠান। সর্ব্বসুদ্ধ ১৪টী ঘর। পাঁচটী বিভিন্ন পরিবার এই রকম ঘরে বাস করে। কেহ ১টা ঘর; কেহ ২টা, কদাচিৎ কেও বা ৩টা ঘর লইয়া আছেন। দক্ষিণ সারির পশ্চিম-পূর্ব্বপ্রান্তে ১টা ঘর সেটা সর্ব্বসাধারণের বৈঠকখানা রূপে ব্যবহৃত হয়। সমস্ত বাড়ীটার লোকের সংখ্যা সম্ভবতঃ ২৫।৩০ জন হইবে। কি করিয়া এতগুলি প্রাণী এইটুকু বাড়ীর মধ্যে বাঁচিয়া থাকে ইহা পল্লীবাসীর নিকট বিস্ময়ের বিষয় হইলেও সহরবাসী দুস্থ পরিবার দিকের সম্পূর্ণ পরিচিত। বীজ হইতে গাছ কি গাছ হইতে বীজ ইহা লইয়া যেমন তর্ক চলিতে পারে, তেমনি পায়রার খোপ দেখিয়া এই সব বাসা তৈয়ারি হইয়াছিল কি এই সব বাসা দেখিয়া পায়রার খোপের জন্ম হয়। তাহা গভীর গবেষণার বিষয়।

উঠানে পা দিয়াই গৌরাঙ্গ ডাকিল, মা! ছোট ছোট এক দল

ছেলে মেয়ে বারন্দায় তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া ছিল। তিনি এক এক করিয়া সকলের কেশের সংস্কার করিয়া দিতেছিলেন।

পুত্রের ডাক শুনিয়া তিনি সেদিনের মধ্যে সব চেয়ে ছোট মেয়েটির কেশের সংস্কার করিতে করিতে বলিলেন, "এই যে আমি, এদিকে আয়।"

গৌরাঙ্গ আর একটু সরিয়া আসিয়া বলিল—মা মণি আমার সঙ্গে এসেছে।

মণি এসেছে। বেশতো ডাক্‌না এখানে। দু'জনে ঘরের মধ্যে এসে বোস।—

পুত্রের দিকে চাহিয়া কথাটা বলিয়া তিনি মেয়েটির কেশের দিকে মন দিলেন।

গৌরাঙ্গ যখন মণিকে সঙ্গে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, মা বলিলেন—"তোমরা একটু বস, বাবা আমার হয়ে গেল বলে।"

মেয়েটির আবার চুলে জটা বাঁধিয়া আসিতেছিল তাহা ছাড়াইতে ছাড়াইতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁরে উমা লাগছে ?"

হ্যাঁ লাগছে একটু—না লাগছে না জ্যাঠাইমা, তুমি দাও—বলিয়া মেয়েটি মাথাটি একবার সরাইয়া লইয়া আবার তাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়া দিল।

তিনি ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "লাগছে আবার লাগছে না—এ কি রকম উমা ?"

উমা কিছু উত্তর করিল না। তাহার চেয়ে একটু বড় গোছের একটি মেয়ে বলিল—"চুলে জট হয়েছে বলে ওর মা বলেছে সব চুল কাঁচি দিয়ে কেটে দেবে, তাই।"

"না রে না তা কখন কাট্‌তে পারে—এমন সুন্দর চুল" বলিয়া তিনি মেয়েটিকে একটু সান্ত্বনা দিলেন।

"এই দেখ জ্যাঠাইমা! উমি কাঁদছে"—একটি মেয়ে বলিল।

"তাই নাকি? দেখি? ছিঃ উমা!" বলিতে না বলিতে উমা ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ফোঁপানির মধ্যেকার কথাগুলির মধ্যে এইটুকু বুঝা গেল যে, সে মাকে কতদিন বলিয়াছে, চুল বাঁধিয়া দিবার জন্য কিন্তু মা দেন নাই; আর এখন তিনি বলিতেছেন যে তাহার চুল কাটিয়া দিবেন। চুল কাটিয়া পাঠশালায় পড়িতে গেলে লোকে তাহাকে কি বলিবে?

গৌরাঙ্গের মা তাহার চোখ মুছাইয়া আদর করিয়া বলিলেন—তুই রোজ বিকেলে আমার কাছে আসিস মা, আমি তোর চুল বেঁধে দেব। বলিয়া তাহার চুল বাঁধা সমাপ্ত করিয়া গামছা দিয়া মুখখানি মুছাইয়া সম্মুখের কৌটা হইতে একটি টিপ লইয়া তাহাকে পরাইয়া দিলেন।

উমা দুঃখ ভুলিয়া প্রসন্ন মুখে সরিয়া বসিল। অপর একটী মেয়ে তাহার স্থানে আসিল। ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে তাহার চুল বাঁধাও হইয়া গেল। তখন সকলে উঠিয়া গেল। গৌরাঙ্গের মা ভিতরে আসিলেন।

গৌরাঙ্গ বলিল—মা, মণি আজ রাতে এখানে ভাত খেয়ে তবে যাবে। আমি ভেবেছিলুম ও আমাকে খেতে বল্‌চে তার বদলে নিজে খেতে এল।

মণীন্দ্র বলিল—"এখানে বামুনের হাতে ক'দিন রান্না খেয়ে আমার অরুচি ধরে গেছে তার তোমাকে খেতে বলব কি! সে যে রান্না, তা আর চিবনো যায় না। আজ যে তরকারী রেঁধেছিল সেটা চচ্চড়ি কি সুক্তু তা বলে না দিলে বুঝবার উপায় ছিল না।" বলিয়া মণীন্দ্র হাসিয়া উঠিল।

তারপর আবার বলিল—"এখন তো আমি দু'দিন মার হাতে খেয়ে নি। তার পর মা যদি অনুমতি করেন তোমাকে রাণাঘাটে নিয়ে যাব। সেখানে গিয়ে মার হাতের রান্না তোমাকে খেতে বলব।"

“মণি ঠিক কথাই বলেছে। আচ্ছা তোমরা তাহলে গল্প কর, আমি কাপড় কেচে আসি।” তিনি চলিয়া গেলেন।

“তুমি ততক্ষণ ওই বইটা একটু দেখ আমি আসছি” বলিয়া ‘ভক্তিযোগ’ বইখানি মণির হাতে দিয়া জামা জুতা খুলিয়া খালি পায়ে খালি গায়ে গৌরাঙ্গ বাহিরে আসিল।

মিনিট ১৫ কাটিয়া গেল তখনও গৌরাঙ্গ ফিরিল না দেখিয়া মণীন্দ্র বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। সে জানিতে পারে নাই বাহির হইতে যে অনেকগুলি কুতূহলী মুখ তাহার পানে উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল। যাহাকে দেখিতেছিল তাহার সঙ্গে চোখোচোখি হইবামাত্র কয়েকটি যুবতী ও মেয়ে চুপ চুপ শব্দ করিতে করিতে পলাইল।

একটি মেয়ে তখনও সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিল। মণি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—“গৌরাঙ্গ কোথায় গেল জান?”

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “জানি, ওই যে ওই ঘরে, পূজোর ঘরে। যাওনা তুমি। জুতো খুলে যেয়ো যেন।” বলিয়া পূর্ব্বদিকের একটি ঘর দেখাইয়া দিল।

কতকটা একা বসিতে ভাল লাগিতেছিল না বলিয়া কতকটা গৌরাঙ্গ কি পূজা করে জানিবার জন্য মণীন্দ্র ধীরে ধীরে সেই ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরের দুয়ারটি অর্দ্ধেকের বেশী ভেজান ছিল। ভিতর হইতে ধূপ ধূনার গন্ধ ও কুঞ্চিত ধূমের রেখা দেখা যাইতেছিল।

নিঃশব্দে মণীন্দ্র ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দুয়ারটি যেমন ছিল তেমনি রাখিয়া দিল।

প্রথমে ভিতরটা ঈষৎ অন্ধকার মনে হইয়াছিল। পরক্ষণে মণীন্দ্র ঘরের মধ্যেকার সব দেখিতে পাইল, খালি দেওয়ালের মাঝামাঝি জায়গায় একজনের একখানি তৈলচিত্র রহিয়াছে। আর তাহার সম্মুখে

মৃত্তিকাসনের উপর গৌরাঙ্গ ধ্যানস্তিমিত নেত্রে বসিয়া আছে। তাহার সুন্দর ঠোঁট দু'খানির মধ্যে অতি ঈষৎ যেন ভাবের আঘাতে নড়িতেছিল আর দুই চক্ষে জলের ধারা বহিতেছিল।

ফটোখানির পানে চাহিয়া দেখিল অতি সুন্দর সুপুরুষ এক যুবকের আকৃতি। সে তৈলচিত্রের পানে চাহিয়া গৌরাঙ্গের পানে চাহিলে মনে হয় ঐ মূর্ত্তি যাহার তিনিই ছবি হইতে বাহির হইয়া এই বালকের মূর্ত্তি ধরিয়া মৃত্তিকার উপর বসিয়াছেন। যিনি ঐ ছবি খানিতে মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে যুক্তকর উঠাইয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন, তিনিই এইখানে নামিয়া আসিয়া তরুণ মূর্ত্তিতে বসিয়া প্রার্থনায় মন দিয়াছেন।

নিঃশব্দে মণীন্দ্র ছবি ও মানুষের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুকের মধ্যে কিসের একটি অব্যক্ত ঈষৎ কম্পাবেগ সে অনুভব করিল। তাহার দেহ বার বার শিহরিয়া উঠিল। দু'টী চক্ষু সজল হইয়া আসিল।

১৭

শয়ন-ঘরে ফিরিয়া আসিয়া গৌরাঙ্গ বলিল, "ওখানি আমার বাবার ছবি।"

মণীন্দ্র বলিল—"আমি দেখিবামাত্র বুঝিতে পেরেছিলাম। উনি কোথায় থাকেন!"

গৌরাঙ্গের মাকে দেখিয়া মণীন্দ্র বুঝিয়াছিল, যে গৌরাঙ্গের পিতা জীবিত।

গৌরাঙ্গ একটু ভাবিয়া বলিল—

মাকে আগে জিজ্ঞাসা করে আসি।

তারপর উঠিয়া মায়ের কাছে রান্নাঘরে গেল।

ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"মা বল্‌তে অনুমতি দিয়েছেন। বলি শোন।"—

'বাবা কোথায়' এ প্রশ্নের উত্তরে গৌরাঙ্গকে উঠিয়া মায়ের কাছে যাইতে দেখিয়া মণীন্দ্র বিস্মিত হইয়াছিল। গৌরাঙ্গ কি বলে শুনিবার জন্য সে গৌরাঙ্গের মুখের পানে সাগ্রহে চাহিয়া রহিল।

গৌরাঙ্গ বলিতে লাগিল:—আমি তোমাকে বাবার সম্বন্ধে যা বল্‌ব তার অর্দ্ধেক আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানা আর অর্দ্ধেক মার কাছ থেকে শোনা।

আমার বাবা ওকালতি করতে আরম্ভ করেছিলেন, তাতে খুব পসারও হয়েছিল। কিন্তু যেমন স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হ'ল, তিনি ওকালতি ছেড়ে স্বদেশীর প্রচার কার্য্য নিলেন। যখন ন্যাশন্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা হ'ল, তিনি তাতে অধ্যাপকের কাজ নিলেন।

ঠাকুমা, মা, বাবা, ও আমি দেশ থেকে কলকাতা এলাম।

আমার বয়স তখন আট বছর। সব কথা স্পষ্ট মনে নেই। তার কারণ এত বেশী ও বিভিন্ন প্রকারের ব্যাপার এক সঙ্গে দেখেছিলাম যে আমার শিশুচিত্ত সে সবের স্পষ্ট ধারণা করতে পার্‌ত না।

কলেজের কাজ শেষ করেই বাবা এখানে সেখানে বক্তৃতা দিতে বার হতেন। তখন চারিদিকেই সভাসমিতি। সকল সভারই চেষ্টা হ'ত বাবাকে সভাপতি করা অন্ততঃ বাবাকে উপস্থিত করানো। মাঝে মাঝে বিভিন্ন জেলা ও এমন কি গ্রামে গ্রামে তাঁকে যেতে হ'ত। এসব ছুটির সময় যেতেন।

তাঁর বক্তৃতায় সমস্ত বাংলা দেশে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। তিনি যা বল্‌তেন, তার উদ্দীপনা লোকের মনে কিছুকাল বিপুল বেগে কাজ কর্‌ত।

বাড়ীতেও তাঁর কাজের অন্ত ছিল না। কত লোকে তাঁর কাছে আদেশ নিতে, উপদেশ শুন্‌তে আসতেন তার সংখ্যা ছিল না।

ঠাকুমা সময়ে সময়ে অনুযোগ করতেন—এত খাটলে শরীর টিক্‌বে কি করে?

বাবা, মিষ্টি হেসে তাঁকে বোঝাতেন, মা তুমিই তো আমাকে দেশের কাছে সঁপে দিয়েছ, এখন ফিরে চাইলে চলবে কেন!

একটা জিনিস বাবার ভিতরে ছিল তার মর্য্যাদা তখন বুঝতে পারিনি, এখন পারি। সভার জয়ধ্বনি তাঁরি নামে জয়ধ্বনি শুনে শুনে লোকের প্রশংসায় অভিনন্দিত হয়ে ফিরে এসে খানিকক্ষণ বাবা উপাসনা করতেন! তাঁর দুই চোখ দিয়ে জল পড়্‌ত আর বল্‌তেন—এ সব গৌরব তোমার দয়াময়। যে কাজ তুমি আমায় দিয়ে করাচ্ছ, যে কথা তুমি আমায় দিয়ে বলাচ্ছ তা আমি কোন দিন কল্পনাও করিনি। এ প্রশংসা, এ জয়লাভ যেন আমাকে বিচলিত না করে। তোমার পায়ে আমার মাথা যেন চিরদিন নত থাকে।

তাঁর নিজের তৈরি এই ভাবের গান তিনি যখন ঘরের মধ্যে একা গাইতেন, বাইরে থেকে মা ও ঠাকুমা শুনতেন, আর তাঁদেরও চোখ দিয়ে জল পড়্‌ত। আমি সব জিনিসটা বুঝতে পারতাম না। তবু চোখের জল দেখে যখন আমারও চোখে জল আস্‌ত, ঠাকুমার কোলে মুখ লুকাতাম।

কোন খানে যাবার আগে সুধু খানিকক্ষণের জন্য নির্জ্জন ঘরে একবার বসতেন। আমরা বাহিরে থেকেই বুঝ্‌তে পারতাম, তিনি মাটিতে বসে চোখ বুঁজে হাত যোড় করে ভগবানের কাছে যা বল্‌লে দেশের কল্যাণ হবে, তাই বলবার প্রার্থনা করছেন। সভায় কিছু বল্‌বার আগে উঠে দাঁড়িয়ে একটুখানির জন্য একবার চোখ বন্ধ করতেন, যেন মনে মনে ভগবানের আদেশ নিতেন।

তার পর ধীরে ধীরে কথা বল্‌তে আরম্ভ করতেন।

তিনি যা বল্‌তেন তার ভিতরে হিংসার কথা কিছু মাত্র থাকৃত না তিনি বল্‌তেন বিলাসিতা ছেড়ে দাও, দেশের শিল্প ও সকল বিষয়ে সরল জীবন ফিরাইয়া আন। সত্যকে বরণ কর, আর নির্ভীক হও।

তাঁহার কথা ছিল সামান্য কিন্তু তাঁর শক্তি ছিল অসাধারণ। সে শক্তি যেন আগুনের মতো সঙ্গে সঙ্গে লোকের মন থেকে জড়তা, ভীরুতা, বিলাসিতা পুড়িয়ে দিত।

কত লোকে বাড়ীতে এসে তাঁর কাছে আত্মনিবেদন কর্‌ত। নিজের গত জীবনের ভুল-ভ্রান্তির কথা বলে নূতন জীবন যাপন করবার ইচ্ছা জানাত। তিনি বলতেন, তিনি তাদের পরামর্শ দিতেন, কিন্তু তারা পেত শক্তি।

শোনা গেল তাঁর বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলবার না থাক্‌লেও তাকে নাকি বন্দী করা হবে কারণ তাঁরই বর্ত্তৃতার কালে দেশে অশান্তির বৃদ্ধি হচ্ছে।

যাবার কিন্তু কিছুমাত্র উদ্বেগ বা চিন্তা ছিল না। কিন্তু তাঁকে রক্ষার জন্য তাঁর ভক্ত অনুরক্ত লোকজনেরও আয়োজনের অন্ত ছিল না। পুলিশের লোক এসে কতবার ফিরে গেল, বাবা বাড়ী ফেরেননি অন্য কোথাও আছেন। পুলিশের লোকগুলা যখন ক্লান্ত হয়ে ফিরে যেত, তখনি কোথা থেকে তারা বাবাকে ফিরিয়ে আন্‌ত। কি করে তারা দশদিকের খবর রাখত, ভেবে আমি আবাক হয়ে যেতাম।

একদিন বাবা কোথায় বেরুবেন বলে উপাসনায় বসেছেন, এমন সময় শোনা গেল—পুলিশ এসে বাড়ী ঘেরাও করেছে। আমি ছুটে ছাদের ওপর গিয়ে দেখলাম বাড়ীটার চারিদিকে পুলিশ এমন করে ঘিরেছে যে, কোন দিক্ দিয়ে আর পালাবার পথ নেই।

একটু পরেই একখানি মোটরকার এসে দুয়ারে দাঁড়াল দু তিন জন সাহেব ও বাঙ্গালী উচ্চপদস্থ পুলিসের কর্ম্মচারী নেমে এসে ওয়ারেণ্ট হাতে বাবার খোঁজ করলেন।

সকলেই বুঝলেন অনেক দিনের চেষ্টা বিফল হওয়ার জন্য আজকে এই ব্যবস্থা হয়েছে। শুন্‌লাম স্বয়ং কমিশনার সাহেব গাড়ীতে এসেছেন।

বাবাকে খবর দেওয়া হল। তিনি শান্ত মুখে ঘর থেকে বার হয়ে মাকে ঠাকুমাকে বল্লেন—তোমরা ভেবনা, আমি আবার ফিরে আস্‌ব। আমার মনের মধ্যে ভগবান্ বলছেন—এখনও আমার কাজ আছে।

বাবা ধীরে ধীরে বাইরে গেলেন। মা ঠাকুমা বাবার সামনে চোখের জল ফেলেন নি। তিনি বাইরে যাবামাত্র ঠাকুমা আমায় কোলে নিয়ে বুকে চেপে ধরে ঝর ঝর করে কাঁদতে লাগলেন। মার চোখের জলে ঠাকুমা; মা ভিজে উঠ্‌লেন।

আমার বুকটা যেন ফেটে যেতে লাগল। একটু পরেই আমি কোল থেকে নেমে এলাম! দেখ্‌লাম—একজন সাহেব বাবার হাতে একখানা কি লেখা কাগজ দিলে সেখানার দিকে একবার মাত্র চেয়ে তারই হাতে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর সাহেবের পিছনে পিছনে এসে গাড়ীতে বসলেন। আর একজন সাহেব যে সব পুলিশ বাড়ী ঘিরে ছিল, তাদের সর্দ্দারকে কি বলে গাড়ীতে উঠে গাড়ী চালিয়ে দিল। মোটর চলে যেতেই এক এক করে তারাও সব চলে যাবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় দু'খানা মোটর এসে উপস্থিত, তাতেও পুলিশের সাহেব কর্ম্মচারী ও দেশীয় কর্ম্মচারীরা ছিলেন। যখন তারা শুন্‌লে যে, বাবা এইমাত্র চলে গেছেন এবং তাঁকে নিয়ে গেছেন বড় সাহেব, তখন তাদের যা ক্ষোভ ও আক্ষেপ এবং পুলিশের ওপর যা রাগ ও আস্ফালন তা আমার অনেককাল মনে থাক্‌বে! তারা তখন সেই মোটর থানার উদ্দেশ্যে তখনি বেরিয়ে গেল।

তখন জানা গেল যারা বাবাকে নিয়ে গেছে তারা বাবার দলেরই লোক ; জাল পুলিশ সেজে ঐরকম করে বাবাকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে গেল। সে রাত্রে আমার মনে হর্ষ বিষাদের দ্বন্দ্ব চলেছিল।

তারপর ৬ মাস বাবার সঙ্গে দেখা হয় নি। খবর পেতাম বাবা বাংলা দেশের আজ এখানে কাল সেখানে এমনি করে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। বক্তৃতা দেবার পরমুহূর্তে তাঁকে নিয়ে তাঁর লোকেরা কোথায় চলে যাচ্ছে তা কেউই জান্‌তে পারছে না। পুলিশ তো নয়ই।

ঠাকুমার কাছে মার কাছে বাবার পত্র মাসে একখানা করে আসত। পত্রে কোন ঠিকানাই থাক্‌ত না।

ছ'মাস কেটে যাবার পর হঠাৎ বাবার পত্র আসা বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর বক্তৃতার কথাও আর শোনা যেত না। একটা বছর কেটে গেল। বাবার কোনই খবর নেই। ঠাকুমা কাঁদতেন। মার চোখেও মাঝে মাঝে জল দেখ্‌তাম।

যে তেজে যে শক্তিতে "স্বদেশী" আরম্ভ হয়েছিল তা আর রইল না। ক্রমে লোকে দামের তুলনা করে সস্তায় বিলিতি কাপড় নিশ্চিন্ত মনে কিন্‌তে আরম্ভ করলে। জিনিস ভাল এই যুক্তিতে বিলিতি সখের জিনিস কিনতে লজ্জাবোধ করলে না। কলকাতাতে এটা আমরা বেশ বুঝতে পারলাম।

এই রকম সময় একদিন হঠাৎ বাবা ফিরে এলেন। তাঁর মুখেই শুন্‌লাম বাবাকে ধরবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল সেজন্য বাবাকে যারা ভালবাসেন তাঁদের অনুরোধে বাবা প্রকাশ্যভাবে কোথাও বার হতে পারেন নি কিন্তু সব বৃথা।

তারপরের কথা বলতে বাবার চোখে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। বাবা বললেন—দেশের লোকে সব ভুলে গিয়েছে। ত্যাগের

যা গৌরব, সংযমের যা শক্তি সব তারা পরিত্যাগ করেছে। আর তাদের বলা বৃথা।

মা জিজ্ঞাসা করলেন—এখন কি পুলিশে তাঁহাকে আর অনুসরণ করবে না।

বাবা উত্তর দিলেন—খবর পাবামাত্র তাহারা তাঁহাকে ধরিবে এবং বিচারে তাঁহার হয় জেল নয় দ্বীপান্তর অনিবার্য্য।

মার ভয়ের সীমা রহিল না। কেন তবে এখন তিনি আসিলেন!

বাবা তখন তাঁর মনের উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

আজ শেষবার তিনি সভায় দেশের লোককে সম্বোধন করিবেন ও শেষ চেষ্টা করিবেন। পুলিশে তাঁহাকে ধরিবে, তিনি তাহার জন্য প্রস্তুত। তাঁহার জীবনের সাধনা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে—আর বাঁচিয়া কি ফল? লোকের মনের সে তেজ চলিয়া গিয়াছে, তাহারা পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা সব ভুলিয়াছে। তিনি ধরা দিবেন—শাস্তি গ্রহণ করিবেন। লোকের মনে পূর্ব্ব কথা যদি তাঁহার এই শেষ চেষ্টায় জাগরুক হয়।

সেই একটা রাত্রি বাবা আমাদের কাছে থাকিলেন। সে রাত্রি কাহারও চক্ষে নিদ্রা আসিল না।

সকালেই কলেজ-স্কোয়ারের সভা। বাবা উপাসনা শেষ করিয়া ঠাকুমাকে প্রণাম করিলেন, মায়ের পানে অতি প্রসন্ন শান্ত দৃষ্টিতে চাহিলেন, আমার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তারপর ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

সেদিনকার সভাতে বাবার আগমন কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, তেমন বক্তৃতা তিনি আর কোন দিন দেন নাই, এমন লোক কম ছিল, যে সেদিন কাঁদে নাই।

তিনি বলিয়াছিলেন, তোমরা ভগবানকে ভুলিয়াছ, দেশকে ত্যাগ

করিয়াছ ; আমি তাই ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য আজ ফিরিয়া আসিয়াছি। একটু পরেই আমি বন্দী হইব। বিচারে যদি আমার ফাঁসী হয় আমি তৃপ্ত হইব। আমার শাস্তির স্মৃতি যেন তোমাদের মনে স্বদেশীর কথা জাগাইয়া রাখে। যদি আমার নির্ব্বাসন বা কারাবাস হয়, সেখানে আমি যে দুঃখ ভোগ করিব সেই দুঃখের অগ্নি যেন তোমাদের চিত্তে সত্যের আলো জ্বালাইয়া রাখে।

পুলিশ ততক্ষণে খবর পাইয়াছিল। যেমন বাবা বক্তৃতা শেষ করিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছেন তৎক্ষণাৎ সশস্ত্র পুলিশ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। বিনা প্রতিবাদে তিনি তাহাদের সঙ্গে গেলেন।

তারপর বিচার হইল। যিনি একটি পীপীলিকারও ইচ্ছা করিয়া প্রাণ নষ্ট করেন নাই, মিথ্যাকে যিনি আজীবন ঘৃণা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার নামে নানা ষড়যন্ত্র অপরাধ আরোপ করিয়া তাঁহাকে দীর্ঘ কারাবাস দণ্ড দেওয়া হইল। বাবার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে! যেদিন ধরে নিয়ে গেল সেইদিন থেকে এক সম্প্রদায়ের লোকের মনে সত্যিকারের দেশসেবার ভাব জেগেছে। হাজার বক্তৃতাতে যা হয়নি, একজনের আত্মত্যাগে তা হয়েছে। বাবার নাম বোধ হয় শুনেছ—বুদ্ধদেব গঙ্গোপাধ্যায়।

গৌরাঙ্গ চুপ করিল। দু'জনের চোখেই তখন জল।

হঠাৎ উভয়েই দুয়ারের পানে চাহিয়া দেখিল, অশ্রুসজল চক্ষে মা দাঁড়াইয়া।

কখন তিনি আসিয়াছিলেন দু'জনের কেহই তাহা জানিতে পারে নাই।

১৮

গৌরাঙ্গ ও মণীন্দ্র বিকালের ট্রেণে রাণাঘাটে আসিয়া নামিল। অনেক দিন গৌরাঙ্গ কলিকাতার বাহিরে আসে নাই। ট্রেণে আসিতে আসিতে দুই পাশে কোথাও গভীর জঙ্গল, কোথাও আম কাঁটালের বাগান, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র, গোচারণ ভূমি ওই সব দেখিয়া বড়ই আনন্দ পাইয়াছিল।

ষ্টেশনের বাহিরে আসিতেই কাকের কলরবে গৌরাঙ্গের চিত্ত আকৃষ্ট হইল। এক সঙ্গে এত কাক ও তাহাদের সম্মিলিত এত প্রচণ্ড কোলাহল সে আর কখন শুনে নাই। সেখানকার যতগুলি গাছ সব গাছের প্রতি পাতায় যেন একটি করিয়া কাক বসিবার আয়োজন করিতেছে। তাহারা বসিতেছে, উড়িতেছে, আবার বসিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ভাষায় যেন বাদানুবাদ করিতেছে!

রাস্তায় পড়িয়া মণীন্দ্রের পশ্চাৎ দক্ষিণ দিকের পথ ধরিয়া গৌরাঙ্গ বলিল—মনে হচ্ছে, যেন এ দেশের যত কাক সব এক সঙ্গে জড় হয়েছে—গাঁয়ের ভেতর এত জায়গা থাক্‌তে এই ষ্টেশনের কাছেই এত কাকের আড্ডা কেন?

মণীন্দ্র হাসিয়া কহিল—"কাকেদের মনের কথাটা ঠিক বলা শক্ত। ষ্টেশনের কাছে ট্রেণে করে যাতায়াতের সুবিধা হবে বলে বোধ হয়।" দুই বন্ধু হাসিতে হাসিতে চলিতে লাগিল।

একটু পরেই উভয়ে ডানধারে পশ্চিম দিকের পথ ধরিল।

গৌরাঙ্গ বলিল—লক্ষ্য করলে দেখা যায় এদের ভেতরেও বেশ দল বেঁধে কাজ করবার চেষ্টা আছে।

মণীন্দ্র বলিল—অন্ততঃ ওদের মধ্যে যে একতা আছে—তার প্রমাণ দেখতে পাবে যদি কোন গতিকে একটা কাক ধরে বেঁধে রাখতে পার।

গৌরাঙ্গ বলিল—তা বটে। তা হলে রাজ্যের যত কাক জুটে কা কা কর্‌তে সুরু করে দেবে—ভাবটা এই—ছেড়ে দাও বেচারাকে,—আর কেন কষ্ট দেওয়া ?

মণীন্দ্র বলিল—সকাল হতেই ওরা উঠে দল বেঁধে যে কার্য্যস্থলে চলে যাবে। শুনেছি ওরা নাকি মাঠে গিয়ে অন্য কোন শস্য যা যখন পায় খেয়ে কাছাকাছি নদী বা পুকুর থেকে জল পর্য্যন্ত খেয়ে তবে বাসায় ফেরে।

কথায় কথায় দুইজনে আর একটা মোড় ফিরিয়া আবার দক্ষিণ দিকের পথ ধরিল।

সেই পথে খানিকটা অগ্রসর হইতেই একটা শোঁ শোঁ শব্দ দুইজনে শুনিতে পাইল।

গৌরাঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল—এ কিসের শব্দ ?

মণীন্দ্র বলিল—ঝাউ গাছের। এবার আমরা এই সাম্‌নের মোড় ফিরব। ওই রাস্তার দু'ধারে ঝাউ গাছ—ওই যে দেখা যাচ্ছে !

দুইজনে শীঘ্রই মোড় ফিরিয়া উক্ত রাস্তায় পড়িল।

গৌরাঙ্গ বলিল—বেশ শব্দ, একটা বেশ বিষণ্ণ অথচ গম্ভীর ভাব আছে।

মণীন্দ্র বলিল—বাবা বলেন, দূর থেকে সমুদ্রের শব্দের সঙ্গে এর মিল আছে।

একটু পরেই তাহারা বাঁ দিকে দেওয়ানি ও ফৌজদারী কোর্ট ফেলিয়া মণীন্দ্রদের বাসার সম্মুখস্থ ময়দানে আসিয়া পৌঁছিল।

এখানে মণীন্দ্র একটু আগে আগে চলিল ; গৌরাঙ্গ গতি একটু মন্থর করিয়া ইচ্ছা করিয়া কিঞ্চিৎ পিছাইয়া পড়িল।

দূর হইতে শান্তি মণীন্দ্রকে দেখিবামাত্র বারান্দা হইতে তাড়াতাড়ি

নামিয়া আগাইয়া আসিতে আসিতে বলিল—এত দেরী করলে যে ছোটদা? পরীক্ষা তো কবে শেষ হয়ে গেছে।

হঠাৎ মণীন্দ্রের পিছনে গৌরাঙ্গের দিকে দৃষ্টি পড়ায় বিস্মিত হইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। দেখিল অতি সুন্দর এক যুবক দাদার পিছন হইতে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া আছে।

শান্তির সমস্ত মুখখানি লজ্জায় ক্ষণকালের জন্য অরুণোদয়ের মত রাঙা হইয়া উঠিল।

একবার ভাল করিয়া গৌরাঙ্গকে দেখিয়া লইয়া সে তাড়াতাড়ি বাসার দিকে ফিরিল।

মণীন্দ্র পিছন হইতে কহিল—

চল্লে কেন শান্তি? এ হচ্ছে আমার সেই নতুন বন্ধু গৌরাঙ্গ। একে লজ্জা করতে হবে না।

শান্তি ততক্ষণে বারান্দায় পৌঁছিল ও একবার বিদ্যুতের মত পিছন ফিরিয়া উভয়কে দেখিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

শান্তির লজ্জা ও বিমুগ্ধ দৃষ্টিটুকু গৌরাঙ্গের কাছে বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছিল। সেই মুখ ও মিষ্ট চাহনির কথা ভাবিতে ভাবিতে গৌরাঙ্গ মণীন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল।

পরদিন সন্ধ্যাকালে বড় ঘরটায় সকলে একত্র বসিয়াছেন। শান্তির প্রথম লজ্জার ভাবটা কাটিয়া গিয়াছে। ঘরটির একধারে উষা, ইন্দু ও শান্তি খোকাকে লইয়া বসিয়া আছে। শান্তি এখনও কথাবার্ত্তায় যোগ দিতে আরম্ভ করে নাই। তবে মন দিয়া সব কথা শুনিতেছে।

গৌরাঙ্গ মণীন্দ্রকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পুত্র জানিয়া প্রথমটা একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। তাহার নিজেদের ক্ষুণ্ণ অবস্থা, জীর্ণ বাসগৃহ মণীন্দ্রকে দেখাইবার পর তাহাদের সহিত এই সুন্দর সুসজ্জিত বাসভবন, স্বচ্ছল অবস্থা দেখিয়া সে কিছুক্ষণের জন্য বিমর্ষ হইয়াছিল। কিন্তু সকলের অমায়িক ব্যবহার মণীন্দ্রের মাতার অকৃত্রিম স্নেহ ও মমতা মণীন্দ্রের বন্ধুত্ব ও শান্তির সুন্দর মুখ ও সুমিষ্ট কাহিনী তাহার মনের বিরুদ্ধ ভাব ধীরে ধীরে দূর করিয়া দিল।

মণীন্দ্র কলিকাতা হইতে পত্রে গৌরাঙ্গের কথা সামান্য কিছু লিখিয়াছিল। গত রাত্রে কোন একটা সময়ে মা বাবা বৌদিদির কাছে মণীন্দ্রের গোপনে কি করিয়া গৌরাঙ্গের সহিত পরিচয় হইয়াছে এবং কি করিয়া সেই পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে সেই সমস্ত বলিয়াছিল। গৌরাঙ্গের পিতার নাম শুনিয়াই সুরেশবাবু তাঁহাকে চিনিয়াছিলেন। শান্তিও দুয়ার হইতে সব কথা শুনিতে পাইয়াছিল।

সকলেরই গৌরাঙ্গের উপর একটি সম্ভ্রমের ভাব ও মমতা জন্মিয়াছিল। স্বেচ্ছায় যাঁহারা দারিদ্র্য বরণ করেন, তাঁহাদের সম্ভ্রম লোকের মনে আপনা হইতে আসে।

সুরেশবাবু মাসিক পত্র বাছিয়া কয়েকটি ভাল কবিতা পড়িয়া সবাইকে শুনাইলেন। গৌরাঙ্গের ভাল লাগিবে ভাবিয়া "স্বদেশ" হইতে কয়েকটি কবিতা পড়িলেন।

তারপর হাসিয়া বলিলেন,—আর একটি অতি নবীন কবির লেখা তোমাদের পড়ে শোনাব। বলিয়া এক খণ্ড কাগজে লেখা একটি কবিতা পড়িলেন।

কবিতার নাম মায়ের স্নেহ।

অতি সরল মধুর ভাষায় লেখা। একটা ছোট মেয়ের জ্বর হইয়াছিল। মা সব কাজ ছাড়িয়া মেয়ের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন। ছোট দু'খানি হাত দিয়া সে মায়ের হাত ধরিয়া কখন ঘুমাইত, কখন অজ্ঞান হইয়া পড়িত। যখনি সে চক্ষু মেলিত, দেখিতে পাইত—মায়ের চক্ষু তাহার উপরে অমৃত বর্ষণ করিতেছে। ডাক্তার বলিয়া গেল, মেয়ের জীবনের আশা নাই। সকলেই আশা ছাড়িল। পিতা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। দাদারা চক্ষু মুছিলেন। মা কিন্তু আশা ত্যাগ করিলেন না, মেয়ের শয্যাপার্শ্বও ছাড়িলেন না। মেয়ে যেন স্বপ্নের ঘোরে দেখিত, কে তাহার পাশে যুক্ত করে বসিয়া প্রার্থনা করিতেছে, কখন তাহার চক্ষে অশ্রু ঝরিতেছে, কখন আশার আভাস ফুটিয়া উঠিতেছে। তাঁহাকে দেখতে যেন অনেকটা তাহার মায়েরই মতো—কিন্তু অতি সুন্দর।

তারপরে যাহার জীবনের কোন আশাই ছিল না, সেই মেয়ে বাঁচিয়া উঠিল—ধীরে ধীরে সে যেন গভীর দীর্ঘনিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল। বহুকাল পরে মায়ের শীর্ণ মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

গৌরাঙ্গ ব্যতীত আর সকলেই বুঝিল এ লেখা কাহার। সুশীলাসুন্দরীর দুই চক্ষু বাহিয়া শুনিতে শুনিতে কতবার জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। শান্তিরই কয়েক বৎসর আগে খুব অসুখ হইয়াছিল, বাঁচিবার আশা প্রায় ছিল না। ডাক্তার পর্য্যন্ত সেবার বলিয়াছিলেন যে, কেবল মায়ের শুশ্রূষার জোরে মেয়েটি বাঁচিয়াছে।

সুরেশবাবু এ কবিতাটি পড়িবার সময়ে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কবিতা শেষ করিয়া তিনি বলিলেন—"তোমরা সবাই প্রায় বুঝেছ এ কবিটি কে। যদি কেউ না বুঝে থাক তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ঐ যে মেয়েটি এই ঘরের এক কোণে গিয়ে বসেছে, কিন্তু মন ঠিক মাঝখানে, যার কপালের উপর কোঁকড়া কোঁকড়া চুল এসে পড়েছে, মুখখানিতে বেশ একটু লাল আভা ফুটে উঠেছে এবং এইমাত্র যে লজ্জায় মাথা নীচু করেছে সেই মেয়েটিই আজকের কবি ; এখন বল কেমন হয়েছে ?"

সকলেই শান্তির পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। গৌরাঙ্গ প্রশংসমান দৃষ্টিতে শান্তির পানে চাহিল। ঠিক সেই মুহূর্তে শান্তিও নতমুখ তুলিয়া একবার গৌরাঙ্গের পানে চাহিয়াই গৌরাঙ্গকেও তার পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া আরও লজ্জিত হইয়া চক্ষু নত করিল। নূতন অতিথিটি কি ভাবিতেছে ইহার একটা অনুমান করিবার জন্যই সে তাহার দিকে চাহিতে গিয়া এইভাবে ধরা পড়িয়া গেল। কিন্তু গৌরাঙ্গ যে প্রশংসার চক্ষেই তাহার পানে চাহিয়াছিল, তাহা এই কিশোরীটির চক্ষু এড়ায় নাই।

মণীন্দ্র প্রথম কথা কহিয়া বলিল—বেশ কবিতা হয়েছে। শান্তি যে এমন পারে তা জান্‌তাম না।

উষা বলিল—ঠাকুরঝি কালে একজন বেশ ভাল কবি হবে। আরও অনেক কবিতা ঠাকুরঝি লিখেছে। 'দুর্দিনের বন্ধু', কবিতাটিও খুব সুন্দর। আর—

উষা আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল কিন্তু শান্তির লজ্জা ও মিনতি-পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিতে সে থামিয়া গেল।

সুশীলাসুন্দরী চোখের জল মুছিয়া ফেলিলেন। তিনি তখনি কিছু বলিতে পারিলেন না, বলিবার প্রয়োজনও ছিল না।

গৌরাঙ্গ বলিল—খুব সুন্দর হয়েছে। পরক্ষণেই সে এই ভাবিয়া লজ্জিত হইল, যে একদিন আসিয়াই একটী কিশোরীর সম্বন্ধে এতটা প্রশংসা করিবার স্বাধীনতা লওয়া হয়ত উচিত হয় নাই।

সুরেশবাবু বলিলেন—সত্যই খুব সুন্দর হয়েছে। এবং ছন্দ, মধুর ভাব ও প্রকাশের ভঙ্গী খুব স্বাভাবিক, শান্তির কবিতা চর্চ্চা করা উচিত।

তারপর আরও অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

খানিক পরে সুরেশবাবু কহিলেন—তোমাদের আজ আমি আরও একটা নূতন খবর দেব। এইখানে, যেখানে আমারা কবিতার চর্চ্চা করছি অনেক ভাল ভাল কাব্যের আলোচনা ও জন্ম এখানে হয়েছে।

সকলে জিজ্ঞাসু ভাবে সুরেশবাবুর পানে চাহিল।

সুরেশ বাবু বলিলেন—কবি নবীনচন্দ্রের নাম তো শুনেছ। তিনি এক সময়ে এখানে ছিলেন। এখানে থাক্‌তে থাক্‌তেই তাঁর কুরুক্ষেত্র লেখা। হয়ত এই ঘরে বসে তিনি কত কাব্য লিখেছেন, সাম্‌নের এই মাঠে পাইচারি কর্‌তে কর্‌তে হয় ত কত নতুন নতুন ভাব তার মাথার ভেতর ফুটে উঠেছে।

আর কেহই একথা জানিত না। ক্ষণেকের জন্য সকলেরই মনে হইল, কুরুক্ষেত্রের কবির কাব্য কথা যেন এখনও এই কক্ষমধ্যে সঙ্গীতের রেশের মতো জাগিয়া আছে।

সুরেশবাবু বলিলেন—এক সময়ে এই কবির সঙ্গে দেখা করতে আর দু'জন লোক এসেছিলেন তাঁদের দু'জনকেই তোমরা চেন। একজন কবি রবীন্দ্রনাথ আর একজন হীরেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের গান পর্য্যন্ত এখানে হয়ে গেছে।

সকলেরই মনে এই বাসাটির উপর বেশ একটু সম্ভ্রমের সঞ্চার হইল।

সে রাত্রে শয়নের পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গৌরাঙ্গ ঘুমাইতে পারে নাই।

শান্তির মধুর কবিতা ও তাহার ততোধিক মধুর সেই সময়কার লজ্জারুণ মুখখানি বার বার মনে পড়িয়া তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়াছিল।

শান্তিও রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছিল আবার যেন কবিতা পড়া হইতেছে, পিতার অনুরোধে সে নিজে কবিতাটি পাঠ করিতেছে। কবিতা সকলেরই ভাল লাগিয়াছে। সকলে যখন ঘর হইতে উঠিয়া গিয়াছেন, শান্তি সেই কবিতার কাগজখানি আপন মনে দেখিতেছে, এমন সময় পিছন হইতে গৌরাঙ্গ আসিয়া তাহার উপর হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল—তোমার কবিতা অতি সুন্দর হইয়াছে। তোমার আরও কবিতা আছে আমাকে শুনাইবে না?

এক অপূর্ব্ব পুলকের বিদ্যুৎ তাহার মনের উপর দিয়া খেলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঘুমও ভাঙ্গিয়া গেল।

জাগিয়া উঠিয়া শান্তি গৌরাঙ্গের সুন্দর মুখচ্ছবি মনে করিল। সে ভাবিল, যদি গৌরাঙ্গ তাহাকে সব কবিতা গুলি দেখাইতে বলে, তাহা হইলে সে তাহা দেখাইবে। কিন্তু গৌরাঙ্গ তাহার হাতের উপর হাত রাখিয়াছিল কেন? তবে সে তো স্বপ্ন! সে সব যদি সত্যকার হইত তাহা হইলেও সে রাগ করিত না। সেই সুন্দর স্পর্শের অনুভূতি এখনও যেন তাহার হাতের উপর লাগিয়া রহিয়াছে।—কয়েকটি সুন্দর সুগন্ধ ফুলের পাপড়ি যেন সেখানটিতে ঝরিয়া পড়িয়াছিল, পুষ্প পরাগ মাখিয়া যেন একটি রঙিন প্রজাপতি হাতের ঐখানটিতে আসিয়া বসিয়াছিল!

চার পাঁচ দিন পরে গৌরাঙ্গ বলিল, যে মা একা আছেন, আর দেরী না করিয়া সে কালই চলিয়া যাইবে।

তথাপি সকলেরই অনুরোধে গৌরাঙ্গকে আরও ৩।৪ দিন থাকিতে হইল এবং এই কয়দিন সকলেরই বড় আনন্দে কাটিল। প্রতি সন্ধ্যায়, সকালে বসিয়া গল্প, পাঠ, ও গানে তন্ময়চিত্ত হইয়া আনন্দ লাভ করিতেন। গৌরাঙ্গের গান, মণীন্দ্রের গানে শান্তির কবিতা সকলেরই মনোরঞ্জন করিত। অনেকগুলি কবিতা লিখিয়া ফেলিয়াছিল এবং সকলই অতি মধুর ও সুন্দর হইয়াছিল। শান্তি যেন কোথা হইতে একটি প্রেরণা অনুভব করিয়াছিল তাহার শক্তি তাহার কবিতার মধ্যে সুস্পষ্ট বুঝা যাইত। যৌবন তাহার দেহ ও মন ভরিয়া যেন পুষ্পের মতো ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। এ কি তাহারি প্রভাব না আরো কিছু ?

গৌরাঙ্গের প্রতি সকলেই সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার স্বদেশী আহার, স্বদেশী পরিচ্ছদ, অত্যন্ত সরল ও শাদাসিদা অভ্যাস, তাহার দেশানুরাগও পিতামাতার প্রতি ভক্তি সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। মণীন্দ্র যখন দেশভক্তির গান গাহিত, তখন গৌরাঙ্গের মুখভাব প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত, পিতার কথা বলিতে তাহার মুখে গৌরবের আভা ফুটিত, চক্ষু সজল হইয়া আসিত। মায়ের কথা বলিতে তাহার অশ্রু ঝরিত। পিতার যেদিন হইতে পঞ্চদশবৎসরের জন্য নির্ব্বাসন হয়, সেই দিন হইতে তাহার মা কত কষ্ট করিয়া তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার মনের গভীর দুঃখ গোপন করিয়া কেমন করিয়া দিবারাত্র আপনাকে কাজের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন, একদিন সে সব কথা বলিতে বলিতে গৌরাঙ্গ সকলকেই অশ্রু সজল করিয়া তুলিয়া আপনি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল।

গৌরাঙ্গ চা পান করিত না। মাছমাংস খাইত না। ভাল বা মূল্যবান খাদ্য খাইতে চাহিত না? বিশেষ উপরোধ করিয়া সুশীলাসুন্দরী দু একদিন তাহাকে ভাল খাদ্য খাওইয়াছিলেন, কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, তাহাতে সে যেন কষ্ট পাইয়াছিল।

ভাল জলখাবার দিতে গেলে সে বলিত, আমি এসব কখন খাইনে, খেতে ভালও লাগে না।

শান্তি একদিন জিজ্ঞাসা করিল, আপনি তাহলে কি খাবার খান?

গৌরাঙ্গ বলিল—ছোলা ভিজান থাকে তাই একমুঠো খাই।

শান্তি কিছু বিস্মিত হইয়া বলিল—তাহার সঙ্গে আর কিছু থাকে না?

'না'।

খেতে ভাল লাগে?

বেশ তো লাগে। ভাতও তো আমরা রোজ খাই, ভাল লাগে না!

রোজ এক খাবার তাই বল্‌ছি।

তাও লাগে। আমার মা আবার তাও খান না। খাই আর খাবার সময় ভাবি এমন কত লোক আছে, যাদের আবার এও জোটে না।

এই কথাবার্ত্তার পরদিন শান্তি চা ছাড়িয়া দিল। একটা পাথর বাটিতে একদিন একমুঠা ছোলাও ভিজাইয়া ছিল; কিন্তু ঊষার কাছে ধরা পড়িয়া গিয়া লজ্জায় খাইতে পারে নাই। মণীন্দ্রও দুই দিন পরে চা ছাড়িয়া দিল।

গৌরাঙ্গ আসার পর সাতদিন কাটিয়া গিয়াছে। আজ সন্ধ্যার ট্রেণে গৌরাঙ্গ কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে। মায়ের জন্য তাহার মন কেমন করিতেছিল, সেজন্য এখানে সকলের সঙ্গ তাহার ভাল লাগিলেও আর থাকিতে পারিতেছিল না।

অপরাহ্নে সুরেশবাবু কাছারী হইতে আসিবার পর-ই সুশীলাসুন্দরী বসিয়া থাকিয়া গৌরাঙ্গকে জলযোগ করাইলেন। আজ আর ভাল জিনিস খাইব না এ আপত্তি তাহার টিঁকে নাই। সুশীলাসুন্দরী, সুরেশবাবু গৌরাঙ্গকে আবার আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বলিলেন—তিনি একবার শীঘ্র তাহার মায়ের সঙ্গে দেখা করিবেন।

যাত্রার সময়ে সকলেরই মন কেমন করিতে লাগিল। মেয়েদের চক্ষু ছল ছল করিতেছিল।

সুরেশবাবু ও মণীন্দ্র গৌরাঙ্গকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিবার জন্য সঙ্গে গেলেন। আর সকলে সম্মুখের মাঠ পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়াছিলেন। শান্তি কেবল বারান্দার এককোণে ম্লান মুখে দাঁড়াইয়া গৌরাঙ্গের যাওয়া দেখিতেছিল।

সে রাত্রে শান্তি অসুস্থতার দোহাই দিয়া সন্ধ্যার পরেই শুইয়া পড়িয়াছিল। গৌরাঙ্গ চলিয়া যাওয়াতে সে কোন দোষ খুঁজিয়া পাইতেছিল না; কিন্তু ইহারই জন্য বুকের মধ্যে এত দুঃখ কেন জমা হইয়া উঠিতেছে? ঘরের আলোটা নিভাইয়া দিয়া বালিশে মুখ লুকাইয়া খানিক ক্ষণ চোখের জল ফেলিয়া তবে শান্ত হইল।

বাড়ী সুদ্ধ সবাই যখন নিদ্রিত, সে রাত্রে তখনও শান্তি ভাবিতেছিল—এতক্ষণ গৌরাঙ্গ কি করিতেছেন? হয়ত এখনও রাত্রি জাগিয়া মায়ের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। গৌরাঙ্গ কি আর সকলের সঙ্গে শান্তির নামও মায়ের সঙ্গে করিতেছেন না?

গৌরাঙ্গ তাহার নাম করিতেছে এই কথা মনে হইতেই তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। চক্ষু আবার সজল হইয়া আসিল।

শান্তি গৌরাঙ্গের অতি সুন্দর মুখখানি ভাবিতে ভাবিতে অনেক রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল।

দুই বৎসর পরের কথা। গৌরাঙ্গ ও মণীন্দ্র দুই জনই বৃত্তি লাভ করিয়া কলিকাতায় একই কলেজে এফ-এ পড়িতেছে। সুরেশ বাবুও একটু চেষ্টা করিয়া কলিকাতায় বদলি হইয়াছেন। ভবানীপুরে বাসা করিয়া সকলে আছেন। ঊষার আনন্দ আরও বাড়িয়াছে। ইন্দু স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া পড়িতেছে। শান্তিও খুব আনন্দে আছে—কারণ, সে প্রায়ই গৌরাঙ্গকে দেখিতে পায়। গৌরাঙ্গদের সহিত সকলেরই ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়াছে। সুশীলাসুন্দরী অনেকবার গৌরাঙ্গদের বাসায় গিয়া তাহার মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তিনিও অনেকবার আসিয়াছিলেন।

শান্তি ১৭ বৎসরে পড়িতে চলিয়াছে। তাহার দুই একটী সম্বন্ধ আসিতেছে, কিন্তু তেমন মনোমত হইতেছে না। হঠাৎ একদিন শুনা গেল—একটি খুব ভাল পাত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পাত্র এম-এ পাশ এবং খুব সম্ভব নমিনেশনে ডেপুটি হইবে—পিতা রায় বাহাদুর ও সুরেশ বাবুর পুরাতন বন্ধু। শীঘ্রই একদিন শান্তিকে দেখিতে আসিবারও কথা হইল।

সেই রাত্রে ঊষা স্বামীর সহিত পরামর্শ করিল।

ঊষা বলিল—আচ্ছা এ পাত্র কি ভাল হবে ?

ফণীন্দ্র। তা না দেখলে কি করে নিশ্চয় করে বলা যাবে। শুনতে ত মন্দ নয়।

ঊষা। আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগছে না। কবে আসবে তারা ?

ফণীন্দ্র। আস্‌ছে সোমবারে

ঊষা। বারণ করে দিলে হয় না ? কেন মিছামিছি আসবে !

ফণীন্দ্র। কি রকম ?

ঊষা। শান্তির বে ও সব জায়গায় হওয়া মুস্কিল। হলেও ও সুখী হবে না।

ফণীন্দ্র। কথাটা একটু স্পষ্ট করেই বল। বাধাটা কি ?

ঊষা। কিছু দেখতে পাও না, চোখদু'টো আছে কেবল চশমা পরবার জন্য।

ফণীন্দ্র মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসুভাবে স্ত্রীর পানে চাহিল। ঊষা তখন বুঝাইয়া বলিল, শান্তি গৌরাঙ্গকে খুব ভাল বাসে। সে আজকাল এত ভাল লিখ্‌তে পারে, ভাল ভাল মাসিক পত্রে তার কবিতা ছাপা হচ্চে তারও কারণ এই। গৌরাঙ্গকে ভালবাসার পর থেকে তার কবি প্রতিভা বেড়ে গেছে। আমি তার কয়েকটা কবিতা লুকিয়ে দেখেছি সে গুলো সে ছাপায়নি। সেগুলো সব গৌরাঙ্গকে লক্ষ্য করে লেখা।

তখন দু'জনে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ চলিল, দু'জনের বিবাহ হইতে পারে কি না।

তখন ফণীন্দ্র বলিল, তুমি তবে মাকে বলিও।

ঊষা বলিল—তুমি বাবাকে বলিও।

শেষটা স্থির হইল, বাবা মা দু'জনকেই বলিতে হইবে এবং দু'জনকে বলিবার ভার দুইজনের উপরই পড়িল।

সুরেশ বাবু শুনিয়া ক্ষণকালের জন্য একটু চিন্তিত হইলেন।

সুশীলাসুন্দরী বলিলেন, আমারও মনে হয় বৌমার কথাই ঠিক।

সুরেশ বাবু ভাবিতে লাগিলেন।

সুশীলাসুন্দরী ভাবিলেন, স্বামী গৌরাঙ্গের দরিদ্র অবস্থার কথাই ভাবিয়া চিন্তিত হইয়াছেন। বলিলেন—ছেলেটি অবশ্য সব বিষয়ে ভাল বল্‌তে হবে। অবস্থা খারাপ; তা হক্, সাবিত্রী তো গরীব জেনেই

সত্যবানের গলায় মালা দিইছিল। শান্তির যদি অদৃষ্টে থাকে, ওই থেকে গৌরাঙ্গ বড় হবে।

সুরেশ বাবু বলিলেন—আমি এ কথাটা তত ভাবছিনে। গৌরাঙ্গ যে রকম ছেলে, যে রাস্তাতেই ও যাক্, তাতেই ও বড় হবে। প্রথম কথা হচ্চে —গৌরাঙ্গের মা রাজী হবে কি না।

রাজী হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি দেখেছি গৌরাঙ্গরও শান্তির উপর বেশ টান হয়েছে। কথাবার্ত্তা কইছে এমন সময় শান্তি এসে পড়লে ওর মুখ কেমন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে দেখনি ?

আরও একটা কথা আছে এর মধ্যে তবে তার জন্যে আমি তেমন ভাবিনে।

কি কথা বল।···

গৌরাঙ্গর ভেতর যে স্বদেশী ভাব আছে, তাকে আমি শ্রদ্ধা করি সন্দেহ নেই—তবে আমার এই চাকরির সঙ্গে ওটা ঠিক খাপ খাবেনা।

খাপ খাবেনা কেন, তুমি, মনে করছ। সেই স্বদেশীর সময় কত-লোককে পুলিশ পিকেটিং অপরাধে ধরে এনে হাজির করেছিল, তুমি ত সাহসের সঙ্গে প্রমাণ অভাব বলে ছেড়ে দিইছিলে। কতলোক আবার সামান্য সামান্য কারণে বাছাদের জেলেও দিইছিল। আর বঙ্কিমবাবু ডিপুটি হলেও বন্দেমাতরং লিখে গিয়েছেন।

সেই জন্য হয়ত তাঁকে অত প্রতিভা স্বত্বেও ডেপুটি রয়ে যেতে হইছিল। যাক্ তার জন্য ভাবিনে, না হয় শেষটা কাজ ছেড়েই দেব।

তা বৈকি। আর এখন ঠাকুরপো রোজগার কচ্ছেন···হরির ইচ্ছায় ফণী কিছু আন্‌ছে। এখন আর তোমার ভাবনা কি ? শান্তির বিয়েটা হয়ে গেলে আর তো কোন দায়ই নেই।

তারপর দু'জনে মিলিয়া ঠিক করিলেন, অন্ততঃ শান্তিকে দেখিতে আসিবে

একথাটা বাড়ীতে একটু রাষ্ট্র করিয়া দেওয়া যাক্। তাহা হইলে ব্যাপারটা কতদুর গড়াইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে তখন সেই মত ব্যবস্থা করা হইবে।

শান্তি যখন শুনিল, তিনদিন পরে তাহাকে দেখিতে আসিবে এবং হয়ত সেই পাত্রকেই মনোনীত করা হইতে পারে, সে একেবারে অকূল পাথার দেখিল।

উষার কাছে সে সজলচক্ষে গিয়া বলিল, বৌদিদি—তুমি মাকে বল, আমি এখন বিয়ে করব না। এখনও কিছু দিন পড়্ব।

উষা বলিল—সেই জন্যেই ত তোমার জন্য একজন ভাল মাষ্টার খোঁজ করা হচ্চে যিনি পড়াটাকে বেশ মিষ্টি ও সরস করে দেবেন।

তুমিও বৌদিদি আমার সঙ্গে এই রকম করে ঠাট্টা করছ। আমাকে তাড়াতে পারলেই তোমরা সবাই তাহলে বাঁচ।

বলিয়া শান্তি কাঁদিয়া ফেলিল।

উষা যখন শান্তির চোখ মুছাইয়া বলিল—"ছিঃ ভাই, একটা ঠাট্টা সইতে পার না। আর এলেই বা দেখতে তারা আইবুড় মেয়েকে কত জায়গায় থেকে দেখতে আসে তাই দেখতে এলেই কি বিয়ে হয়? আসে আসুক্ না, একটিবার দেখেই চলে যাবে।"

না বৌদিদি আমি যখন এখন বিয়েই করব না, তখন এসব অনর্থক কেন?

আচ্ছা সত্যি করে বলতো ঠাকুরঝি! তোমার এখন বিয়ে করতেই মন নেই, না আর কাউকে মনে মনে ভাল বাস। আমাকে বল আমি কাউকে বল্‌ব না।

শান্তি মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

শান্তির কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়া তাহাকে বাহুর মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল—"আচ্ছা, গৌরাঙ্গ যদি তোকে বিয়ে করতে চায় তো কি বল্‌বি?"

শান্তি এবারও কিছু বলিল না কিন্তু তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

ঊষা বলিল—"গৌরাঙ্গকে ভালবাসিস্। নয়?"

শান্তি তাহার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন চাপিবার জন্য ঊষার কোলে মুখ লুকাইল।

ঊষার চক্ষেও জল আসিয়াছিল। সে শান্তিকে বাহুর বাঁধনে বাঁধিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

২২

পরদিন সুরেশ বাবু বলিলেন—"ফণী, কৈলাশ কিছু দিনের জন্য দার্জ্জিলিং গেছে, সেখান থেকে ফিরেই বিবাহের কথা ঠিক করতে আস্‌বে। কৈলাশ খুব সুপাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু আগে গৌরাঙ্গের সঙ্গে চেষ্টা করে দেখা কর্ত্তব্য। যদি গৌরাঙ্গের মায়ের মত না হয়, তখন এইখেনেই ঠিক করতে হবে।"

ফণী বলিল—"আমার মনে হয় গৌরাঙ্গের মায়ের কোন অমত হবে না।"

আমার তা মনে হয় না। তার কারণ গৌরাঙ্গের বাবা এখন বোধ হয় পাঁচ বছর দ্বীপান্তরে থাক্‌বেন। হয়ত গৌরাঙ্গের মা বল্‌বেন, এ পাঁচ বছর না গেলে গৌরাঙ্গের বিয়ে দেওয়া তাঁর উচিত হবে না। শান্তিকে পাঁচ বছর সেই আশ্বাসে রাখা কি উচিত হবে?

কথাটা ফণীন্দ্রের মনে লাগিল। ফণীন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—"তবু তো চেষ্টা করে দেখা যাক্ একবার।"

সেইদিনই সুশীলাসুন্দরী ও ঊষা মিলিয়া গৌরাঙ্গদের বাড়ী আসিলেন।

গৌরাঙ্গের মায়ের কাছে সুশীলাসুন্দরীই কথাটা পাড়িলেন, কিছুক্ষণ তিনি একটু বিমনা হইয়া রহিলেন ; পরে বলিলেন—"এর চেয়ে গৌরাঙ্গের বেশী সৌভাগ্য আর কিছু হতে পারে না। তোমরা তাকে ভালবাস বটে খুব ; তবু এতখানি যে করতে চাইবে, তা ভাবিনি। কিন্তু দিদি, আমার অদৃষ্টের কথা ত জান। আর পাঁচ বছর পরে তিনি ফিরবেন। তার আগে আমার এত বড় আনন্দটা ভোগ করা কি ঠিক হবে ? তা নইলে এর চেয়ে সুখের কথা তো কিছু নেই দিদি।"

কথাটার সঙ্গে সঙ্গে গৌরাঙ্গের মায়ের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

উষা আগেকার রাত্রের ব্যাপারটা গৌরাঙ্গের মাকে বলিল।

গৌরাঙ্গের মা সব শুনিয়া বলিলেন "আচ্ছা মা আমি আজকের রাতটা ভেবে কাল একথার উত্তর তোমাদের বাসায় গিয়ে দিয়ে আস্‌ব।"

দিনের সমস্ত কাজ শেষ করিয়া সন্ধ্যার পর গৌরাঙ্গের মা পূজার ঘরে আসিয়া দুয়ার বন্ধ করিলেন। স্বামীর তৈল চিত্রের সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া একদৃষ্টে চিত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ধূপ ধূনার সুরভিত, কক্ষ স্তিমিত প্রদীপের আলোক যেন কোন্ সুদূর শান্তিময় স্বপ্নরাজ্যে রূপান্তরিত হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ সেই চিত্রের মুখপানে চাহিয়া থাকিতে তাঁহার দুই চক্ষে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। চক্ষে সে চিত্র লুপ্ত হইয়া অন্তর আলোকিত করিয়া ফুটিয়া উঠিল। তখন ভূমিতলে মাথা লুটাইয়া করযোড়ে তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন।

আমায় আজ তুমি বলিয়া দাও, আমি কি করি। কত কাল তোমায় দেখি নাই, কত বৎসর তোমার একছত্র লেখাও পাই নাই ; তবু তোমার মুখপানে চাহিয়া আছি। তুমি সেই বন্ধুহীন আত্মীয়হীন দ্বীপান্তরে কত কষ্ট পাইতেছ ইহা ভাবিয়া সংসারের সুখ যে আমার অসহ্য হইতেছে।

গৌরাঙ্গের মঙ্গল কিসে হইবে আমার চেয়ে তুমি বেশী জান। তুমি আমায় বলিয়া দাও, আমায় বুঝাইয়া দাও আমি কি করিব। তোমাকে ছাড়িয়া গৌরাঙ্গের বধূ আনিয়া সংসার আমি কোন প্রাণে করিব? আর গৌরাঙ্গ যদি শান্তিকে ভালবাসিয়া থাকে, কোন প্রাণে আমি তাহাকে কঠিন হইয়া বলিব না বিবাহ হইবে না।

তুমি এস—আমি এভার একা বহিতে পারি না। তুমি আসিয়া তোমার ভার লও। যদি না আস, আমায় দয়া করিয়া বলিয়া দাও—আমি কোন পথে যাই। বল—আমায় দয়া কর।

বুঝি এমনি করিয়া ডাকিলে এতখানি আকুলতা আসিলে দূর দূরান্তর-স্থিত আত্মার সহিত আত্মার মিলন হয়। চক্ষে যাহাকে দেখা যায় না সেই বাঞ্ছিতকে অন্তরে পাওয়া যায়। ভূলুণ্ঠিতা পূজারিণীর ধীরে ধীরে বাহ্যজ্ঞান চলিয়া গেল। সেই লুপ্ত বাহ্য জ্ঞানের অন্তরালে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল।

যখন তাঁহার জ্ঞান হইল, তখন চক্ষের জলে বসন ভিজিয়াছে, মৃত্তিকা কেমন হইয়াছে, আর হৃদয় শান্ত শীতল হইয়াছে। এই ধ্যানের মধ্য দিয়া তিনি যেন স্বামীর অন্তরের বাণী শুনিয়াছেন।

২৩

পরদিন সন্ধ্যাকালে গৌরাঙ্গের মা গৌরাঙ্গকে সঙ্গে করিয়া পদব্রজে মণীন্দ্রের মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। গৌরাঙ্গ লজ্জায় মাকে ভিতরে পৌঁছাইয়া দিয়া মণীন্দ্রের পড়িবার ঘরে চলিয়া গেল—মণীন্দ্রের বিশেষ অনুরোধেও বাড়ীর মধ্যে গেল না।

সুশীলাসুন্দরী গৌরাঙ্গের মায়ের হাত ধরিয়া বলিলেন, এস দিদি এস। ঊষা তাড়াতাড়ি আসন পাতিয়া দিল।

আসন কেন আবার মা। দিব্যি মেজে, আমি মেজেতেই বস্‌ছি। পায়ে যে ধূলো। ইন্দু একঘটি জল ও গামছা আনিয়া পা ধুয়াইয়া দিতে গেল। গৌরাঙ্গের মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "থাক মা—থাক মা আমিই ধুচ্চি।" বলিয়া পা ধুইয়া আসনটার পার্শ্বেই বসিয়া পড়িলেন। সুশীলা-সুন্দরীর মনে পড়িল, মণীন্দ্র একদিন বলিয়াছিল, জ্যেঠাইমা কখন গাড়ীতে চড়েন না, ভাল খান্‌ না।

গৌরাঙ্গের মা বলিলেন—আমি আজ সে কথাই বল্‌তে এসেছি। কিন্তু শান্তি মা কোথায় গেল? একবার শান্তিমার সঙ্গে দেখা করে শেষে বল্‌ব দিদি

শান্তি তখন ঠিক পাশের ঘরেই তাঁহারই কথা শুনিবার জন্য দুরু দুরু হৃদয়ে বসিয়াছিল। সুশীলাসুন্দরী সেই কক্ষ দেখাইয়া দিতে তিনি সেখানে আসিয়া দেখিলেন শান্তি নতমুখে একখানি বই হাতে মেজের উপর বসিয়া। তাঁহাকে দেখিয়া শান্তি "সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিতে তিনি বলিলেন—"ব'স মা বস। লজ্জা কি মা! আমি তোমার মা। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। বেশ করে ভেবে তার উত্তর দিও মা।"

শান্তি নতমুখে উৎকণ্ঠ হইয়া রহিল।

তিনি বলিলেন—সাবিত্রী যেমন সত্যবান্ গরীব ও অল্পায়ু জেনেও তাঁর গলায় মালা দিইছিলেন, তুমিও মা তেমনি গৌরাঙ্গের অনুগামিনী হয়েছ। সুধু একটা কথা ভেবে দেখো মা—গৌরাঙ্গ চিরদিনই গরীব থাক্‌বে, হয়ত অনেক দুঃখ অনেক বিপদ তাকে মাথা পেতে নিতে হবে। তুমি রাজা বাপের মেয়ে, কত সুখের সংসারে—ঐশ্বর্য্যের মাঝখানে—তোমার স্থান হতে পারে। সে সব ছেড়ে এই গরীবের ঘরে আসার জন্য তোমার কোনদিন অনুতাপ হবে না তো মা?

শান্তি উত্তর দিবার একটু চেষ্টা করিল—কিন্তু ছোট্ট একটি না কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না, সে সুধু নতজানু হইয়া গৌরাঙ্গের মায়ের পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল এবং বিগলিত অশ্রুধারায় তাঁহার পা দু'টি সিক্ত করিয়া দিল। তিনি সস্নেহে শান্তিকে উঠাইয়া সজল চক্ষে তাহার মুখ চুম্বন করিয়া তাহার আর্দ্র চক্ষু মুছাইয়া দিয়া কহিলেন—"অনুতাপ করবার মেয়ে তুমি নও মা—অনেক ভাগ্যে তোমাকে পাব।"

গৌরাঙ্গের মাতা শান্তিকে লইয়া পূর্ব্বেকার কক্ষে আসিয়া বলিলেন—"তোমার এই মেয়েটিকে আমি নিলাম আজ থেকে। তবে যে রত্ন রাজার ঘরে শোভা পেত, তুমি তাই ভিখারীকে দিলে দিদি।

সুশীলাসুন্দরীর মুখ হর্ষোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শান্তি লজ্জায় আর মাথা তুলিতে পারিতেছিল না। উষা কক্ষান্তরে গিয়া শান্তিকে একা পাইয়া সাদরে তাহার চিবুক নাড়িয়া দিয়া বলিল—"এবার তাহলে ঠাকুরঝি একটিবার শাঁক বাজিয়ে দিই।

গৌরাঙ্গের মাতা স্বামীর অবগতির জন্য পত্র দিলেন—ও বিবাহের জন্ত অনুমতি চাহিলেন। যথাসময়ে উত্তর আসিল। তিনি আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিয়াছেন। সুধু লিখিয়াছেন—তোমার জ্ঞান ও কর্ত্তব্য বুদ্ধির উপর কাছে থাকিয়াও আমি চিরদিন নির্ভর করিয়া আসিয়াছি। আজ দূরে থাকিয়া কিছুতেই তাহার ব্যতিক্রম হইতে দিব না।

একমাস পরে ফাল্গুন মাসের প্রথমের দিকেই বিবাহের দিন স্থির হইল। গৌরাঙ্গের মায়ের অনুরোধে বিবাহে কোন প্রকার আড়ম্বর হইল না। যেটুকু নহিলে নয়, কেবল তাহাই হইল। মণীন্দ্র বরপক্ষে চলিয়া আসিল, গৌরাঙ্গকে আগাইয়া লইয়া চলিল। ফণীন্দ্র কন্যাপক্ষে দেখিতে লাগিল।

কোন বাদ্য নাই, আলোক নাই, সজ্জা নাই এ অবস্থায় গৌরাঙ্গ মণীন্দ্র ও পুরোহিত সঙ্গে বিবাহ করিতে আসিল।

বিবাহের রাত্রে সুরেশবাবুও কোনরূপ বাহ্যাড়ম্বর করেন নাই। রাত্রে উৎসবের মধ্যে কেবল সানাইয়ের ব্যবস্থা ছিল। সন্ধ্যা হইতে বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত সময়টুকু সুধু শানাই বাজিয়াছিল। শানাই যেন অতি মধুর স্বরে ডাকিয়া বলিতেছিল—এস বর, এস বধূ, তোমরা পরস্পরকে গ্রহণ কর, দু'জনে আজ হইতে হাত ধরাধরি করিয়া জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ না হউক তাহাতে যেন আনন্দের অভাব না থাকে, পথে যেন পাখীর গান, গাছের ছায়া, মুকুলের গন্ধ, কুসুমের রূপ তোমাদের আনন্দ বিধান করে। তোমাদের পরস্পরের সঙ্গ যেন তোমাদের কাছে সব চেয়ে বড় সম্পদ হয়।

বিবাহ শেষ হইয়া গেলে শানাই কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইয়া শেষরাত্রে—

আবার তাহার সুরে সকলের চিত্ত প্লাবিত করিতে লাগিল। এবারকার সুর যেন কারুণ্যভরা। যেন শানাই অতি করুণ স্বরে বলিতে লাগিল যাহাকে এতকাল বক্ষের তপ্তনীড়ে মানুষ করিয়াছ—আজ তাহাকে বিদায় দাও। মুখে যদি হাসি না আনিতে পার, চক্ষের জল টুকু মুছিয়া ফেলিও। শানাইয়ের এই মধুর করুণ সুর যাহার কাণে গেল, তাহারি হৃদয় সানন্দ ও ব্যথায় ভরিয়া গেল। পিতামাতার চক্ষে অশ্রু আনিল, ভ্রাতার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল, বাসর-শয়নে শুইয়াও বরবধূর হৃদয়ে বেদনানুরঞ্জিত আনন্দের সঞ্চার করিল।

প্রভাতে বরবধু বিদায় লইয়া আপন গৃহে আসিল। গৌরাঙ্গের মা বধূকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। আনন্দের মধ্যেও তাঁহার বেদনার অন্ত ছিল না। যে ঘরে গৌরাঙ্গের পিতার আলোকচিত্র ছিল, সেই ঘরে কুশণ্ডিকা আরম্ভ হইল—সেই চিত্রের পানে চাহিয়া মন্ত্র পড়িবার সময় দু'জনেরই মনে হইতেছিল, যেন ঐ চিত্রের মূর্ত্তি সজীব হইয়া তাহাদের পানে চাহিয়া আছেন ও তাঁহার নয়ন হইতে আশীর্ব্বাদ ঝরিতেছে।

গৌরাঙ্গের মা দুয়ারের নিকট দাঁড়াইয়া এক একবার ছবির পানে চাহিতেছেন ও ভাবিতেছেন, আজ যদি ইনি উপস্থিত থাকিতেন এত দুঃখের মধ্যেও আনন্দের অবধি থাকিত না। পাড়ার দুই চারিটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আজ এখানে খাইবে, সে ব্যবস্থা করিতেছেন, আর এক একবার কাণ পাতিয়া কি যেন শুনিতেছেন। যেন মনে হইতেছে, যে পদ শব্দ অনেকদিন অনেক বৎসর শোনেন নাই—তাহাই যেন দুয়ারে আসিয়া নামিল—যে কণ্ঠস্বর অনেক দিন কাণে যায় নাই, সেই মধুর স্বরে কে যেন বলি বলি করিতেছে—এই যে আমি আসিয়াছি।

কুশণ্ডিকা শেষ হইয়া গেল। পুরোহিত আহারাদি করিয়া চলিয়া গেলেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আনন্দ করিতে করিতে আহার

সমাপন করিল। দূর হইতে উঁকি মারিয়া ও কাছে আসিয়া তাহারা বধূকে বারকয়েক দেখিল। 'ওরে খুব সুন্দর বৌ; আবার কাল এসে দেখ্‌ব' বলিয়া ছুটিয়া পলাইল।

গৌরাঙ্গ দেখিল—মা আজ বড়ই উন্মনা আছেন—হাতে কাজ করিতেছেন, কিন্তু চক্ষু কর্ণ যেন আর কোথাও পড়িয়া আছে। বহু দূরে যেন কাহাকে দেখিতেছেন—বহু দূর হইতে যেন কাহার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিবে সেই প্রত্যাশায় তাঁহার সারা চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে।

কলিকাতার কর্ম্মক্লান্ত দিন শেষ হইয়া চলিয়াছে। পাড়ার কয়েকটি গৃহিণী বধূ দেখিয়া একান্ত চিত্তে বধূর প্রশংসা করিয়া গেলেন। পাশের বড় বাড়ীগুলিতে একে একে আলো জ্বলিয়া উঠিল। ছোট ছোট বাড়ীগুলি হইতে শঙ্খধ্বনি শুনা গেল।

গৌরাঙ্গ বলিল, মা তুমি এবার কিছু খাও। শান্তি খাবার আনিতে উদ্যত হইল। মা বাধা দিয়া বলিলেন, "আরও খানিকটা যাক্‌ মা। আজ যেন আমি কিছুতে স্থির হতে পাচ্ছিনে।"

হঠাৎ বাহিরের দুয়ারে একটা শব্দ হইল। গৌরাঙ্গের মা চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। "দেখ্‌ তো বাবা—বলিয়া দরজার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন; আর যেন কথা যোগাইলনা।

গৌরাঙ্গ বাহিরে যাইবার পূর্ব্বেই এক আগন্তুক বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাহার মাথার কেশ ছোট করিয়া ছাঁটা, দীর্ঘ কৃশ দেহ একখানি শুভ্র বস্ত্র খণ্ডে আবৃত। মুখে প্রসন্ন দৃষ্টি; তাহাতে গভীর শান্তি, বিপুল শক্তি ও অসীম সহিষ্ণুতার লেখা ফুটিয়া রহিয়াছে।

আগন্তুককে দেখিবামাত্র গৌরাঙ্গের মাতা 'এতদিনে এলে' বলিয়া ছুটিয়া তাঁহার পদতলে অর্দ্ধ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

গৌরাঙ্গ ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মুখপানে চাহিয়া ও পরক্ষণে তাঁহার

পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। শান্তিও স্বামীর অনুসরণ করিল।

ইনিই বুদ্ধদেব, গৌরাঙ্গের পিতা। সুদীর্ঘ কারাবাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই হঠাৎ অতর্কিত মুক্তি, পাইয়া গৃহে ফিরিয়াছেন। বুদ্ধদেব পুত্র ও পুত্রবধূর মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন; বলিলেন, "তোমাদের আশীর্ব্বাদ কর্‌বার জন্যই ভগবান্ আমাকে সহসা মুক্তি দিয়েছেন।"

পরে অতি স্নেহভরে স্ত্রীর হাত ধরিয়া উঠাইয়া গৃহমধ্যে আনিয়া বসাইলেন। স্নিগ্ধ ও মধুরস্বরে বলিলেন, "বড় কষ্টই পেয়েছ জাহ্নবী।"

স্বামীর কারাবাসে ক্লিষ্ট ও কৃশ দেহের পানে ভাল করিয়া চাহিতে জাহ্নবীর ত্ু'টি চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। অতি ধীরে মৃদুকণ্ঠে বলিলেন আজ সকাল থেকে আমার কেবল মনে হয়েছে—তুমি আস্‌ছ, তুমি আস্‌ছ। আর আমাকে একা ফেলে যেওনা।

২৫

কারাগারে বুদ্ধদেবের বৎসর কয়েক কষ্টের অবধি ছিলনা। আজ এ জেলে কাল ও জেলে এই করিয়া তাঁহার ৩।৪ বৎসর কাটিয়াছিল। যখনই এক জেলে নানা কষ্ট ও প্রতিকুল অবস্থায় তিনি আপনার চিত্ত স্থির করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—তখনই তাঁহাকে অন্যস্থানে সরানো হইতেছিল। শেষে তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, কারাগার সর্ব্বত্রই সমান—একটি বৃহৎ কারাগারের এক একটি কক্ষ বিশেষ। এক কারাগার হইতে অন্য কারাগারে যাওয়া, এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে যাওয়া মাত্র,—তাহাতে বিচলিত হইবার কিছুই নাই। ঠিক এই সময় হইতে তাঁহাকে কিছুকাল নির্জ্জন কারাবাস ভোগ করিতে হয়।

সাধারণ কারাবাস অপেক্ষা—নির্জ্জন কারাবাস যে বহুগুণে কষ্টকর সমাজের মানুষকে আর তাহা বলিয়া দিতে হয় না। প্রথম প্রথম বুদ্ধদেবের অসহ্য কষ্ট হইয়াছিল। বাহিরের কদাচিৎ পাখীর ডাক, কুক্কুরাদির চীৎকার, এমন কি প্রহরীর রূঢ় পদধ্বনি তাঁহাকে কথঞ্চিৎ শান্তি দিত। সতর্ক কর্ত্তৃপক্ষ যেন তাহাও বুঝিয়া লইল। তাহার পর হইতে যেন পাখী উড়িয়া গেল, কুকুর স্তব্ধ হইল, প্রহরীরা শব্দবিহীন পদক্ষেপে চলিতে লাগিল।

এই সব পরিচিত শব্দ অভাবে বুদ্ধদেব কিছুকাল যেন পাগলের মত হইলেন। ক্রমশঃ তিনি অশান্ত আত্মাকে শান্ত করিতে সমর্থ হইলেন। তিনি ঈশ্বর চিন্তায় মন দিলেন।

কোন দিক্ দিয়া চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইবার কোন আশঙ্কা নাই;—বুদ্ধদেবের স্বদেশঅন্ত প্রাণ ঈশ্বরে সমর্পিত হইল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি ঈশ্বর চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিতে লাগিলেন। প্রহরীর দেওয়া খাবার কত দিন তিনি স্পর্শও করিতেন না; তাহার জন্য কোন অভাবও অনুভূত হইত না। নির্জ্জন কারাবাসেও তাঁহার আর কোন কষ্ট রহিল না। তখন আবার তাঁহাকে নির্জ্জন কারাবাস হইতে মুক্তি দিয়া সাধারণ কারাগারের অন্তর্গত করিয়া লওয়া হইল।

এইরূপে আরও কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। নির্জ্জন কারাবাসের বিশেষত্ব এখানেও তিনি বজায় রাখিলেন। কর্ত্তৃপক্ষ তখন তাঁহার উপর আর রুদ্রদৃষ্টি রাখিতে চাহিলেন না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি যদি গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে আর যোগ না দেন—তাহা হইলে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

বুদ্ধদেব বলিলেন, তিনি চিরদিন স্বদেশের সেবা করিয়াছেন—তবু তাঁহাকে এত দীর্ঘকাল বন্দী থাকিতে হইয়াছে। স্বদেশের মঙ্গল ও

গভর্ণমেণ্টের অমঙ্গল যদি একই পথে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে তিনি নিরুপায়।

আরও কিছুদিন কাটিয়া গেল। বুদ্ধদেব হঠাৎ একদিন কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কেন যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন না।

২৬

অসাধারণ মনের জোরে গৌরাঙ্গের মাতা জাহ্নবী এতদিন এত দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করিয়া সংসার করিয়াছিলেন। স্বামী আসার পর হইতে তাঁহার আর কোন দুঃখ রহিল না। মাতৃ-অন্ত-প্রাণ পুত্র, সেবাপরায়ণ পুত্রবধূ—ও দেবতার মত স্বামী সবই তিনি পাইলেন। কিন্তু এই সময় হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

একমাসের মধ্যে জাহ্নবী শয্যা গ্রহণ করিলেন। গৌরাঙ্গ চিকিৎসক ডাকিয়া আনিল। চিকিৎসক বলিলেন, ইহা কঠিন হৃদ্‌রোগ—সারিবার নহে। স্বল্প উত্তেজনায় যে কোন সময়ে মৃত্যু হইতে পারে। যাহাতে মনে কোন দুঃখ, কোন উদ্বেগ—না আসে তাহাই করা প্রয়োজন।

কিন্তু জাহ্নবীদেবীর উদ্বেগের অবসান কেমন করিয়া হইবে? শেষ জীবনে যে তিনি স্বামীকে ফিরিয়া পাইবেন, এ ভরসা তাঁহার ছিলনা তাই স্বামীকে ফিরিয়া পাইয়াও কখন্ কি হয় এই ছিল তাঁহার ভাবনা এজন্য দুঃখের অবসানেও তাহার উদ্বেগের নিবৃত্তি হইল না।

বুদ্ধদেব কোন রাজনৈতিক সভাসমিতিতে যোগ দিতেন না ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ—দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা, উক্ত বিষয়ে প্রবন্ধাদি লেখা—এই ছিল তাঁহার কাজ।

তিনি জাহ্নবীকে ভরসা দিতেন, তুমি নিশ্চিন্ত হও, আর আমার কোন ভয় আমার নাই। কেন তুমি এত ভাব ?

তবুও জাহ্নবীর ভাবনা কমিত না।

এই ভাবে ছয় মাস কাটিয়া গেল।

একদিন অপরাহ্নে গৌরাঙ্গ মায়ের চরণ বন্দনা করিয়া কহিল, মা আমি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছি, বোধ হয় বৃত্তিও পাব, মণিও প্রথম বিভাগে পাশ হয়েছে।

মায়ের মুখে আনন্দের জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। পুত্রের মাথায় হাত দিয়া তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন।

একটু পরে ভাবনার মেঘে আবার তাহা ঢাকিয়া গেল।

শান্তি শাশুড়ীর পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—মা আপনি এত দুর্ব্বল কি করে হয়ে গেলেন ? আপনার সে শক্তি—সে সাহস কোথায় গেল মা ?

জাহ্নবী হাসিয়া বলিলেন—উনি এসেছেন, এখন সব ভার ওঁর। আর আমার শক্তির কি দরকার মা ?

শান্তি বলিল—আপনাকে আবার শক্ত হতে হবে মা ! আপনি কেন এত ভাবেন মা ? আর তো কোন ভয় নেই।

ভাল থাকিলে জাহ্নবী একটু আধটু ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কাজ করিতে চাহিতেন। কিন্তু শান্তির সতর্ক দৃষ্টির কাছে পরাজিত হইতেন। হাসিয়া বলিতেন—মা তোমার কি চারদিকে চক্ষু।

সুশীলাসুন্দরী দেখিতে আসিলে জাহ্নবী দেবী বলেন—"দিদি, তোমার কাছে আমি চিরঋণী রইলাম। তুমি আমাকে অমূল্য রত্ন দিয়েছ, আর আমার কোন দুঃখ নেই।"

তবে কেন সেরে উঠ্‌তে পারছনা দিদি ?

সুশীলাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করেন।

জাহ্নবী বলেন—তোমার কাছে আমি গোপন করবনা দিদি। আমার কেবলি ভয় হয়, পাছে আবার কোথা থেকে কোন্ দুঃখ বুঝি বা আসে, আবার বুঝি বা কাউকে নিয়ে যায়।

বলিতে বলিতে জাহ্নবীদেবীর মুখখানি ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়।

সুশীলাসুন্দরী তাঁহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া বলেন, "অনর্থক এমন ভয় কোরোনা দিদি।"

জাহ্নবী একদিন মাসিক পত্র পড়িতেছিলেন, তাহাতে এক স্বদেশ সেবকের কারাকাহিনী ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছিল। প্রকাশিত অংশে ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাকে ১০টি বিভিন্ন কারাগারে প্রেরিত করা হইয়াছিল। দুঃখের মাঝে মানুষ ধীরে ধীরে মন স্থির করিয়া লয়; ইহাতে কিন্তু সময়ের প্রয়োজন হয়। এক স্থানে এক সঙ্গে কিছুকাল থাকিতে পাইলে তবে মানুষ মনের সঙ্গে একটা বোঝা পড়া করিয়া লইতে পারে। একে তো কারাগার, যেখানে মানুষের কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই—তাহার উপর অনবরত স্থান, কক্ষ ও প্রহরীর অনবরত পরিবর্ত্তন। কয়েকটা দুঃখ সহিয়া লইয়া জীবনকে সহন যোগ্য করিয়া লইতে না লইতে আবার একটি পরিবর্ত্তনের ঢেউ আসিয়া সকল ব্যবস্থা উলট্ পালট্ করিয়া দিল। ইহার যে কি দুঃখ, কি অশান্তি তাহা যেন বর্ণনার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সে বর্ণনা পড়িতে পড়িতে জাহ্নবীর চোখ দু'টি বার বার জলে ভরিয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, কি দারুণ কর্ম্মে তাঁহার স্বামীর জীবন অতি দীর্ঘকাল কাটিয়াছে; কি অপরিমেয় সহিষ্ণুতার সহিত তিনি এ সমস্ত সহ্য করিয়াছেন। আসিয়া পর্য্যন্ত কৈ এ সম্বন্ধে কোন একটা কথাও ত তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হয়

নাই। লোকে আপনার সম্বন্ধে তুচ্ছ কথাও বড় করিয়া বলে; আর ইঁহার, আপনার সম্বন্ধে বড় কথাও তাঁহার কাছে অতি তুচ্ছ।

বেশীক্ষণ আর সে কাহিনী পড়া হইল না। বুকে কেমন একটা বেদনা বাজিতে লাগিল। বই রাখিয়া বুকটা চাপিয়া জাহ্নবী কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। মন কিন্তু তাঁহার আর্ত্তনাদ করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। কোথায় কোন কারাকক্ষের কঠিন প্রস্তর শয্যার উপর যেখানে তাঁহার স্বামীর পবিত্র মহৎ জীবন অপরিসীম কষ্টে অতিবাহিত হইয়াছে।

অনেকক্ষণ বিশ্রামের পর জাহ্নবী অনেকটা সুস্থ হইলেন।

দ্বিপ্রহরে আহারাদ্দির পর জাহ্নবী স্বামীকে বলিলেন—"কত কষ্টে তোমার দিন কেটেছে তার একটা কথাও তো তুমি আমাকে বল্‌লে না!"

বুদ্ধদেব। তার চেয়ে ঢের বেশী কষ্ট যে তুমি পেয়েছ জাহ্নবী; কাজেই সে সব কথা তোমার কাছে কোন্ মুখে বল্‌ব বল?

জাহ্নবী। আমি আর তোমার ও কথায় ভুল্‌ছিনে। আমি ছেলে নিয়ে তবু স্বাধীন ভাবে ছিলাম, দিনান্তে ইচ্ছামত দু'টো মুখে দিচ্ছিলাম, গৌরাঙ্গের মুখে মা বুলিও শুন্‌ছিলাম। আর তুমি—?

বুদ্ধদেব। কি গভীর দুঃখ ও দায়িত্বের মধ্যে যে তোমাকে ফেলে গিয়েছিলাম—তা আমিই জানি। তুমি ছাড়া খুব কম নারীই এ অবস্থায় তোমার মত কর্ত্তব্য করে যেতে পার্‌ত। গৌরাঙ্গ যে আজ এমন হয়েছে, সে তো তোমারি কাজ; অথচ আমার চেয়েও নিরানন্দে তোমার দিন কেটেছে।

জাহ্নবী। কষ্ট তুমি বেশী পেয়েছ কি আমি বেশী পেয়েছি—এনিয়ে তোমার সঙ্গে আমি আর তর্ক কর্‌ব না। কিন্তু আমি তোমার কারাবাসের কথা না শুনে ছাড়্‌ব না।

বুদ্ধদেব। আচ্ছা, তুমি তাই শুনো। আর একটু সেরে ওঠো

তারপর আমি সবিস্তারে তোমাকে সব কথা বোলবো। তোমার কোন ক্ষোভ রাখ্‌ব না।

জাহ্নবী। আজ আমি আর এর চেয়ে জিদ্ কোরবো না; কিন্তু ভুলে যেওনা যেন।

বুদ্ধদেব। না ভুল্‌ব না। কিন্তু তোমার আজ এসব কথা কেন মনে হ'ল?

জাহ্নবী। মনে একথা আমার অনেকদিন থেকেই হচ্ছে; বলি বলি করে এতদিন বলা হয়নি। আজ একখানা মাসিকে কারা-কাহিনী প'ড়ে একথা জান্‌বার জন্য বড় আগ্রহ হয়েছে।

বুদ্ধদেব। তোমার অসুস্থ শরীরে এসব লেখা এখন পোড়োনা।

জাহ্নবী। তোমরা হাসালে দেখ্‌ছি। একটা মেয়ে মানুষের শরীরের জন্য অত কেন গা! তুমি বল্‌চো পোড়োনা, বৌমা বল্‌চেন—মা উঠোনা, গৌরাঙ্গ বল্‌চে মা কথা কোয়োনা।

বুদ্ধদেব। তোমার প্রাণ যখন আমাদের সকলের কাছে এত মূল্যবান্, তখন আমাদের পানে চেয়ে তোমার শরীরে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত!

জাহ্নবী। তা তোমাদের সব কথাই তো শুন্‌ছি; আর কি কোরবো বল।

এমন সময় শান্তি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া শাশুড়ীর পায়ের কাছে বসিল। শ্বশুর মাথার কাছে বসিয়াছিলেন।

জাহ্নবী বলিলেন—একটু শুলে না কেন মা? সেই সকাল থেকে উঠে সমানই খাট্‌ছ।

শান্তি বলিল—দিনে শুতে ইচ্ছে করে না মা। রাত্তিরে তো শীঘ্রই কাজ সারা হয়ে যায়; ঘুমের কিছুই অভাব হয়না তো মা।

জাহ্নবী স্বামীকে বলিলেন—বিবাহ দেবার সময় আমার এক একবার ভয় হ'ত যদি তোমার অপছন্দ হয়।

বুদ্ধদেব। একথা কেন তোমার মনে হ'ত? তোমার মতে আমি তো কখন অমত করিনি।

জাহ্নবী। তা নয়; একটু ভয় হ'ত যদি তুমি মনে কর আমাদের এ অস্থায় বড়লোকের ঘরের মেয়ে কেন আনা? আমার মাকে দেখে কে বল্‌বে যে, আমাদের ঘরে মাকে মানায় না!

বুদ্ধদেব। মা আমার সত্যকার বড় লোকের মেয়ে; সে জন্য মাকে এ ঘরেও শোভা পেয়েছে। মা অন্নপূর্ণাকে ভিখারী শিবের ঘরেই বেশী মানিয়ে ছিল।

শান্তি লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া শাশুড়ীকে বাতাস করিতে লাগিল।

কিছু পরে গৌরাঙ্গ কলেজ হইতে ফিরিল। মায়ের পায়ের কাছে শান্তির পাশে বসিয়া মায়ের পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"আজ কেমন আছ মা?"

জাহ্নবী বলিলেন—ভাল আছি, বাবা। আগে হাত মুখ ধুয়ে জল খেয়ে আয়—তারপর বসিস্।

'আচ্ছা, যাচ্চি মা,' বলিয়া—গৌরাঙ্গ মায়ের পায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল।

জাহ্নবী আবার একবার বলিতে গৌরাঙ্গ উঠিল। শান্তির দিকে চাহিয়া জাহ্নবী বলিলেন—"বৌমা, তুমিও এখন একটু উঠে যাও।"

গৌরাঙ্গ তখনও দুয়ার পার হয় নাই। সে মুখ ফিরাইয়া বলিল, কোথায় খাবার থাকে আমি জানি তো মা, আমি নিজেই নিয়ে খাচ্চি।

গৌরাঙ্গ পুস্তকাদি রাখিয়া কলতলায় গেল, জলের শব্দে জাহ্নবী তাহা বুঝিলেন। ঘরের শিকল খোলার শব্দে তিনি বুঝিলেন, গৌরাঙ্গ এবার

খাইতে বসিবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে পড়িল, চালের জালায় যে পেঁপেটা রাখা হইয়াছে সেটা বোধ হয় পাকিয়াছে। পেঁপেটি ভাল পাকে নাই বলিয়া তিনি শান্তিকে চাউলের মধ্যে রাখিতে বলিয়াছিলেন।

জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করিলেন—"পেঁপেটা পেকেছে কিনা, বৌমা, দেখেছ কি ?" শান্তি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে দেখে নাই।

জাহ্নবী একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, তবে যাওনা মা ; যদি পেকে থাকে আধখানা কেটে তাকে দিয়ে এস ; পেঁপে সে বড় ভালবাসে।

শান্তি শাশুড়ীর সেবা ছাড়িয়া উঠিবে কিনা ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া বুদ্ধদেব বলিলেন, "তুমি যাও মা, গৌরাঙ্গের 'জলখাওয়া' হলে দু'জনে এস—আমি ততক্ষণ এঁর কাছে বস্‌ছি।"

শান্তি উঠিয়া গেল।

বুদ্ধদেব জাহ্নবীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "বৌমাটি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।"

জাহ্নবী বলিলেন, 'সত্যিই তাই'।

হঠাৎ বাহিরের দুয়ারে কড়া নাড়িয়া কে ডাকিল—"বাড়ী আছেন ?"

'আমি চট্ করে দেখে আসি কে' বলিয়া বুদ্ধদেব উঠিয়া গেলেন।

জাহ্নবীর মনটা যেন হঠাৎ ছাঁৎ করিয়া উঠিল, খানিক সময় গেল, বুদ্ধদেব ফিরিলেন না। জাহ্নবী কেমন যেন ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ; পায়ে পায়ে আগাইয়া ধীরে ধীরে গৌরাঙ্গের পড়িবার ঘরে আসিলেন। মাঝখানের দুয়ারটা ভেজানো—পরের ঘরটিতে স্বামী কাহাদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

গৌরাঙ্গের চেয়ারের উপর বসিয়া জাহ্নবী উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

বুদ্ধদেব। এর কারণ কি ?

আগন্তুক। আমরা তা জানিনে। গভর্ণমেণ্টের আদেশ আপনাকে দেখালাম। সমুদ্রের ধারে আপনি থাক্‌বেন, বেশ স্বাস্থ্যকর স্থান, আপনার স্বাধীনতায় কেউ হস্তক্ষেপ কর্‌বে না। কেবল সেখান থেকে আস্‌তে পারবেন না, এই পর্য্যন্ত।

বুদ্ধদেব। অশেষ ধন্যবাদ। অনেকখানি স্বাধীনতাই দেবেন আপনারা। যদি এই গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ছিল, আমাকে মুক্তি না দিলেই হ'ত।

আগন্তুক। বিচারের ভার আমাদের উপর নেই, আছে শুধু কাজের ভার।

বুদ্ধদেব। কত কাল থাক্‌তে হবে আমাকে সেখানে ?

আগন্তুক। ঠিক বল্‌তে পারিনে আপনি বাংলা দেশে আস্‌তে পারবেন্ না এই পর্য্যন্ত জানি।

বুদ্ধদেব। আর একটা কথা। আমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যেতে পারি কি ? তিনি অত্যন্ত অসুস্থ।

আগন্তুক। মাপ কর্‌বেন। সেখানে আপনার একা থাকাই ব্যবস্থা হয়েছে। চাকর পাচক সব আপনি পাবেন।

জাহ্নবীর আর শুনিবার ক্ষমতা হইল না। তিনি বিস্ফারিত নেত্রে দুয়ারের দিকে একবার চাহিলেন। তাঁহার বক্ষঃস্পন্দন বারকয়েক দ্রুত হইয়া হঠাৎ একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল। চেয়ারের উপর হেলান দিয়া যেমন বসিয়া ছিলেন তেমনই রহিলেন।

বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, আমি একবার বাড়ীর ভিতর যেতে পারি ?

আগন্তুক বলিলেন, যাবেন, কিন্তু দয়া করে শীঘ্র ফির্‌বেন।

বুদ্ধদেব উঠিলেন। দুয়ার খুলিতেই জাহ্নবীকে দেখিলেন। দুয়ার বন্ধ করিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, 'তুমি তাহলে সব শুনেছ?'

উত্তর নাই। বুদ্ধদেবের মন কাঁপিয়া উঠিল। তবে কি—?

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে বুদ্ধদেব জাহ্নবীর গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, বক্ষঃ পরীক্ষা করিলেন, নাড়ী দেখিলেন। বুঝিলেন সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

কিছুক্ষণ স্থির ভাবে বুদ্ধদেব সদ্যমৃতা স্বাধ্বী-পত্নীর মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। অতি স্নেহভরে একবার তাঁহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, আগেই চলে গেলে!

২৭

বুদ্ধদেব ধীর পদক্ষেপে আবার সেই ঘরে আসিলেন। পুলিশ কর্ম্মচারীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার স্ত্রী এইমাত্র হার্টফেল করে মারা গেছেন; তাঁর শেষ কাজ করার অনুমতি পাব কি?"

অনুমতি মিলিল। ডাক্তারকে একবার দেখান উচিত তাই ডাকা হইল। তিনিও মৃত্যুর ঐ একই কারণ নির্দ্দেশ করিলেন।

গৌরাঙ্গ সজল নেত্রে মায়ের পানে চাহিয়া রহিল। শান্তি 'মা' 'মা' করিয়া শাশুড়ীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল।

সুরেশ বাবুর কাছে সংবাদ গেল। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সপরিবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাহারো চক্ষু শুষ্ক রহিল না।

সুশীলাসুন্দরী কাঁদিয়া কহিলেন, দিদি, "তোমার মত ভাগ্য যেন আমারও হয়। আমিও যেন এমনি সব রেখে যেতে পারি।"

সেই অবস্থায় জাহ্নবীর একখানি ফটো লওয়া হইল। অবিলম্বে

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা হইয়া গেল। যে এই অপরূপ মৃত্যুর কথা শুনিল, সেই শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। জাহ্নবীর দেহ খাটের উপর রাখিয়া পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হইল। তারপর গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া তাঁহার শেষ-কৃত্য করিয়া সকলে ফিরিল।

বৃদ্ধদেব খুব সংক্ষেপে সুরেশ বাবুকে বলিলেন, "দুয়ারে আমার সারথি দাঁড়িয়ে, এখনি রথে উঠ্‌তেই হবে। আর কি বল্‌ব? ভয় ছিল যার জন্য—তিনি নির্ভাবনায় দেশে চলে গিয়েছেন। সেজন্য আর উদ্বেগ নাই।"

সুরেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় আপনাকে রাখ্‌বে সে কথা বলেছে?

বৃদ্ধদেব বলিলেন, 'না, সুধু বলেছে সমুদ্রের ধারে এই পর্য্যন্ত। সেখানেই রাখুক্ তার জন্য আমার আর কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। জাহ্নবী আমাকে যে পাথেয় দিয়ে গেছেন, ভগবানের পায়ে তাই সমর্পণ করে আমি পরপারে যাবার অধিকার অর্জ্জন করে নেব।

গৌরাঙ্গকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, গৌরাঙ্গ, তোমাকে আমি কোন দিন শিক্ষা দিতে পারিনি; কিন্তু তুমি যাঁর কাছে শিক্ষা পেয়েছ, তিনি আমার চেয়েও ঢের বড়। তোমার শিক্ষা সফল হবেই। আমি সুধু তোমাকে একটা কথা বলে যাই—বিত্ত ও বিদ্যা আগে অর্জ্জন করবে, তারপর সব দেশের সেবায় নিয়োগ কর্‌বে—এক কথায় দেশের জন্য সব ত্যাগ কর্‌বে। তোমার দেশবাসীর হৃদয়ে ত্যাগের মূল্য স্থায়ী না হলেও ক্ষোভ কোরোনা। সে তো এক দিনের কাজ নয়। শত সহস্র ত্যাগের মণিমাণিক্যে দেশমাতার সিংহাসন গড়ে উঠবে। বহু সহস্রের ত্যাগের মহিমায় যখন সবারি হৃদয়ে ভক্তি ও শক্তি জেগে উঠবে—সেই হবে সিংহাসনের বল। আয়োজনকে কাজের সমাপ্তি ভেবে হতাশ হোয়ো না।

শান্তিকে ডাকিয়া বুদ্ধদেব বলিলেন, মা, তোমাকে তো কিছুই বল্‌বার নেই। তোমাকে আমি চিনেছি। আমার একমাত্র ক্ষোভ এই তোমাকে আর কিছু দিন দেখে যেতে পারলাম না। তুমি যে গৌরাঙ্গের সব সৎকার্য্যে সহায় হবে, তা তোমাকে দেখেই আমি বুঝেছি।

তখন সন্ধ্যা আসন্ন। কার্য্য শেষ করিয়া বুদ্ধদেব বাহিরে আসিয়া পুলিশ কর্ম্মচারীদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। পুলিশকর্ম্মচারীরা তাঁহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল। কারামুক্ত বুদ্ধদেব এক বৎসরের মধ্যেই নিরুদ্দেশ যাত্রা করিলেন।

গৌরাঙ্গ একই দিনে পিতামাতা দু'জনকেই হারাইল।

২৮

সে রাত্রে সুরেশচন্দ্র, সুশীলাসুন্দরী ও মণীন্দ্র গৌরাঙ্গের কাছে রহিলেন। আর সকলে বাসায় ফিরিল। পরদিন সুরেশবাবু চলিয়া আসিলেন মায়ের সঙ্গে মণীন্দ্র কিছুদিন রহিয়া গেল।

শ্রাদ্ধ মিটিয়া গেল। সুশীলাসুন্দরী একদিন গৌরাঙ্গকে বলিলেন, "এখন দিন কতক ও বাড়ীতে গিয়ে থাক্‌লে ভাল হয়।"

গৌরাঙ্গ বলিল, মা এখানে ছিলেন। কত বছর তাঁর সঙ্গে এই বাড়ীতে কাটিয়েছি। এ বাড়ী ছেড়ে গেলে যেন মাকে ছেড়ে যাচ্ছি বলে মনে হয়। কিন্তু আপনি আর কতদিন এখানে থাক্‌বেন্; ওঁদের সব কষ্ট হচ্ছে। আপনি বরং যান্। মাঝে মাঝে আমি গিয়ে আপনাকে নিয়ে আস্‌ব। এখন তো আপনি ছাড়া আর কেউ রইল না।

সুশীলাসুন্দরী ধীরে ধীরে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। বলিলেন, "তোমার পিতামাতা দেবতা ছিলেন। তাঁদের জন্য ক্ষোভ করতে নাই। মা

বেঁচে থাকলে আবার তো সেই আগেকার মত কষ্ট পাইতেন। তাঁহার মত সতীলক্ষ্মী কয়জন থাকে? তাঁহার জন্য দুঃখ করিতে নাই।

মা তাঁহাকে কত দুঃখ কষ্টে মানুষ করিয়াছেন তাহার জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, কত ভাল তাহাকে বাসিতেন, সে সব কথা সজল নয়নে বলিল। মায়ের ছবিখানি পিতার ছবির পাশে রাখিয়া দিল। পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সহিত পিতামাতার পূজা করিতে লাগিল।

গৌরাঙ্গকে একটু শান্ত করিয়া সুশীলাসুন্দরী বাসায় ফিরিয়া গেলেন। তিনি সপ্তাহে দুইদিন আসিয়া কন্যা জামাতার সন্ধান লইতে লাগিলেন! গৌরাঙ্গ একাগ্রচিতে বিদ্যা অর্জ্জন করিতে মন দিল। সে যেন অধ্যয়নের তপস্যা। কলেজের পাঠ সারিয়া সে প্রতিদিন সাহিত্য ও ইতিহাসের পুস্তকাদি পড়িয়া নিয়ম ও আয়াস সহকারে জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

জ্ঞান-পিপাসা, ভাবা জ্ঞান, গভীর অধ্যয়ন ও মধুর স্বভাবের জন্য গৌরাঙ্গ কলেজের অধ্যাপকদিকের অতি প্রিয় পাত্র হইয়াছিল। কলেজের যাবতীয় অনুষ্ঠানের সহিত সে ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট রহিল। কলেজের ডিবেটিং সোসাইটির সে সেক্রেটারী, কলেজ ম্যাগাজিনের সে সম্পাদক ও শ্রেষ্ঠ লেখক, সেবাসমিতির সে সভাপতি।

এই সমস্ত অনুষ্ঠানের সহিত এত ঘনিষ্টভাবে লিপ্ত থাকিলেও তাহার অধ্যয়নের অনুরাগ সমভাবেই ছিল। এত বিষয়ের নেতৃপদ পাইয়াও তাহাকে নিরতিশয় শান্ত ও সংযত দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইত।

ক্রমে পরীক্ষা আসিল। গৌরাঙ্গ ও মণীন্দ্র পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইল। গৌরাঙ্গ সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিল।

মা নাই, বাবা বহু দূরে—আনন্দ সংবাদ বহন করিয়াও ম্লানমুখে গৌরাঙ্গ কুটীরের দুয়ারে পৌঁছিল।

ভিতরে আসিতেই শান্তি স্বামীর মুখপানে চাহিয়া বলিল—"তোমাকে আজ এত কাতর দেখাচ্ছে কেন ?"

গৌরাঙ্গ বলিল—পরীক্ষায় আমি আজ প্রথম হয়েছি ;—কিন্তু মাকে আজ কোথায় পাব যে এ খবর দিয়ে মায়ের মুখে হাসি দেখ্‌ব।

গৌরাঙ্গের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। শান্তিও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলনা।

একটু পরে শান্তি উঠিয়া ক্ষিপ্রহস্তে রন্ধন শেষ করিয়া স্বামীর কাছে আসিল।

গৌরাঙ্গ বলিল—বাবা যাবার দিন বলে গেছেন আগে কিছু অর্জ্জন করে, পরে দেশের জন্য তা ত্যাগ করবে। চাকরিতে অর্থ অল্প, আইন ব্যবসা করাই আমার ইচ্ছা। তোমার যদি আপত্তি না থাকে আমি ব্যারিষ্টারি পড়ার জন্য বিলাত যেতে যাই।

শান্তি ধীরে ধীরে বলিল, তোমার যাতে উন্নতি হবে, আমি তাতে অমত কেন কর্‌ব ?

গৌরাঙ্গ বলিল, স্বধু যে ব্যারিষ্টারি পড়ার জন্যই বিলাত যেতে চাইছি তা নয় ;—স্বাধীনতা জিনিসটা আমরা জানিনে। স্বাধীন দেশ না দেখ্‌লে স্বাধীনতার ধারণা পর্য্যন্ত ঠিক হয়না। আমরা চিরকাল বদ্ধই আছি, মুক্তি কাকে বলে জাননা. একবার অন্ততঃ মুক্তির মূর্ত্তি দেখে আস্‌ব।

আহারাদির পর সেই-রাত্রেই গৌরাঙ্গ শান্তিকে লইয়া শ্বশুর বাড়ীতে গেল। ব্যারিষ্টারি পড়িবার সংকল্পও সেখানে প্রকাশ করিল। কেহই এ প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন না। মাসখানেক পরে বৃত্তিলাভ করিয়া গৌরাঙ্গ বিলাতযাত্রা করিল।

শান্তি পিত্রালয়ে রহিল।

২৯

গভীর রাত্রে সুশীলাসুন্দরী দুঃস্বপ্ন দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন। স্বপ্নে কতক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়াছেন তাহার ঠিক নাই; এখনও দু'টি চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত।

স্বামীকে জানাইয়া সুশীলাসুন্দরী বলিলেন—"আজ পর্য্যন্ত আমার কোন সাধ তুমি অপূর্ণ রাখনি। আজ আমার মনে শেষ সাধ উদয় হয়েছে। এটিও তুমি পূর্ণ করে দাও!"

সুরেশ। কি সাধ বল? তোমার গলার স্বর ভারী কেন, চোখে জল কেন?

সুশীলা। একটা স্বপ্ন দেখেছি।

সুরেশ। দুঃস্বপ্ন?

সুশীলা। ঠিক দুঃস্বপ্ন বলা যায়না; বরং সুস্বপ্নই—তবু মনে কষ্ট হয়েছে।

সুরেশ। কি স্বপ্ন?

সুশীলা। স্বপ্ন দেখেছি—আমি মৃত্যু শয্যায়। তুমি আমার শিয়রে বসে। শান্তি, ইন্দু, বৌমা পাসে বসে কাঁদছে, ফণী আর খোকা আমায় কেবল ডাকৃছে, কিন্তু আমি উত্তর দিতে পারছিনা; মণী আর ফণী পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে। তোমাদের সবাইকে রেখে যেতে পারছি মনে করে আমার আনন্দই হচ্ছিল; কিন্তু মণীর মুখের পানে চেয়ে মনে হ'ল, তার মুখখানি বড় ম্লান। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল মণীর বৌকে তো আমি দেখে যেতে পার্‌লাম না। মণীর বৌ দেখে গেলে আমার আর কোন দুঃখ

থাক্‌বে না। শীগ্‌গির মণীর একটি বৌ এনে দেও। দেরী কর্‌লে আমার অদৃষ্টে তাকে আর দেখা হবেনা।

সুরেশ। তাই হবে। এ আর বেশী কথা কি? ভেবেছিলাম লেখাপড়া শেষ করিয়ে বিয়ে দেব;—তা তোমার যখন ইচ্ছা তখন দেরী কর্‌ব না।

সুশীলা। তা হলে আমার জীবনের কোন সাধ অপূর্ণ থাক্‌বেনা।

সুরেশ। মণীর কাজকর্ম্মের একটা ব্যবস্থা কর্‌তে পারলেই আমরা দু'জনে কিছুদিন তীর্থভ্রমণে বা'র হব।

সুশীলা। আমার মনে নিচ্ছে আমি আর বেশীদিন বাঁচবনা। তা হোক্, তাতে আমার কোন ক্ষোভ নেই। তোমার সঙ্গই আমি চিরদিন তীর্থ মনে করে এসেছি—আজও তাই মনে করি। অন্য তীর্থে আমার লোভ নেই।

ইহার পর দু'জনের কাহারও চক্ষে আর নিদ্রা আসিলনা। ঐ প্রসঙ্গের কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে রাত্রি প্রভাত হইল।

প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া সুরেশবাবু আফিসে বসিয়া কাজ করিতেছেন এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, দু'টি বাবু দেখা করিতে আসিয়াছেন। একটি সুসজ্জিত ঘরে তাঁহাদের বসানো হইল। একটু পরেই সুরেশবাবু আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন।

ভদ্রলোক দুইজন মণীন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে একজন কন্যার পিতা—নাম গণেশ মুখোপাধ্যায়। পূর্ব্বে ওকালতী করিতেন, এক্ষণে বিস্তীর্ণ জমীদারী লাভ করিয়া ওকালতী ছাড়িয়া দিয়াছেন। জমীদারী ২৪ পরগণা ও যশোহরের নানাস্থানে বিস্তৃত; উপস্থিত কলিকাতেই বাস করেন। অপর ভদ্রলোকটি তাঁহার বন্ধু।

পরস্পর বংশ পরিচয়াদি হইল।

সুরেশবাবু। বিবাহ আর একটু দেরীতেই দেবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু আমার স্ত্রীর ইচ্ছাতে সে সংকল্পের পরিবর্ত্তন করেছি। মেয়েটির বয়স কত?

গণেশবাবু। ১৩।১৪ বৎসর হবে।

সুরেশ। মণীন্দ্রকে আপনারা একবার দেখে যান্। তারপর আমি বা আমার স্ত্রী গিয়ে মেয়েটিকে দেখে আস্‌ব

গণেশ। ছেলেটিকে আমরা ভাল করেই দেখেছি। ইন্‌ষ্টিউটে এ একদিন আর গোলদীঘিতে একটি সভায় একদিন আপনার ছেলেকে গান গাইতে শুনেছিলাম। সে গান শুন্‌বার মত বটে।

সুরেশ। হাঁ, মণী বড় মধুর গায়। তবু একবার দেখা ভাল।

এমন সময় আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ের গাড়ী দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ইন্দু পুস্তকাদি লইয়া গাড়ী হইতে নামিল। এই বিদ্যালয় প্রায় শীতকাল ব্যতীত সব সময়েই সকালে বসে। আজ শনিবার ৮টায় ছুটি হইয়াছে।

সুরেশবাবু ইন্দুকে ডাকিয়া বলিলেন, মণীকে একবার এখানে পাঠিয়ে দিওতো মা।

গণেশবাবু ইন্দুর দিকে একবার বিস্মিতভাবে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —আপনার তো একটি মেয়ে—এ মেয়েটি কে?

সুরেশবাবু হাসিয়া বলিলেন—এটি আমার মা।

ইন্দু মৃদু হাসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

একটু পরেই মণীন্দ্র আসিয়া বলিল, কি বল্‌ছেন বাবা?

সুরেশবাবু। তুমি কি করছিলে?

মণীন্দ্র। আপনি সেদিন বলেছিলেন, Hero and Hero Worshih অনুবাদ কর্‌তে—তাই একটু করছিলাম।

সুরেশ। কতখানি হয়েছে ?

মণীন্দ্র। অৰ্দ্ধেক হবে।

সুরেশ। কি রকম লাগ্‌ছে ?

মণীন্দ্র। বেশ ভাল। তবে সময়ে সময়ে মনে হচ্ছে, মূল লেখার শক্তি অনুবাদে রাখ্‌তে পাচ্ছিনা।

সুরেশ। লেখকের পক্ষে এটা শুভলক্ষণ।

মণীন্দ্র। কেন বাবা ?

সুরেশ। কারণ তার দ্বারা বোঝা যায়, লেখকের আদর্শ আরো উচ্চে। হ্যাঁ, আপাততঃ তোমাকে ডেকেছি এঁদের সঙ্গে দেখা কর্‌তে। এঁরা তোমার গানের সুখ্যাতি কর্‌ছিলেন। এঁদের প্রণাম কর।

মণীন্দ্র তাঁহাদের প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুরেশবাবু বলিলেন, এবার তুমি যেতে পার।

মণীন্দ্র আপনার কাজে ফিরিয়া গেল।

দুইজনই বলিলেন—সুন্দর ছেলে আপনার, যেমন রূপে তেমনি গুণে। আমাদের মেয়েটি দয়া করে নিন্—অবশ্য যদি অপছন্দ না হয়।

সুরেশবাবু বলিলেন—আমারও আর কোন আপত্তি নেই এখন প্রজা-প্রতির নির্ব্বন্ধ। আমরা যে কেউ ৫টা থেকে ৬টার মধ্যে যাব।

তাঁহারা ঠিকানা দিয়া উঠিয়া গেলেন।

সুরেশবাবু উঠিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সুশীলাসুন্দরীকে ডাকিয়া বলিলেন—তোমার ইচ্ছাশক্তি অসামান্য আজ সকালেই মণীর বিবাহের সম্বন্ধ এসেছে। এই তাঁদের সঙ্গে কথা কয়ে আস্‌ছি। বালিগঞ্জে তাঁদের বাড়ী। আমি বলে এসেছি—হয় তুমি না হয় আমি ৫টা সাড়ে ৫টায় গিয়ে দেখে আসব।

সুশীলাসুন্দরীর মুখমণ্ডল হর্ষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দুই হাত যোড়

করিয়া তিনি বলিলেন—"মায়ের দয়া; তা নইলে সঙ্গে সঙ্গে কি আজই এ প্রস্তাব আসে। দেখো, এই মেয়ে নিশ্চয়ই তোমার পছন্দ হবে।"

সুরেশ। তাহলে তুমিই গিয়ে দেখে এস। তোমার পছন্দ হলেই আমার হবে।

সুশীলা। আমি কি তোমার চেয়ে বেশী বুঝি? তুমি যাও।

সুরেশ। তবে, চল, দু'জনেই যাই।

সেই কথাই স্থির রহিল।

যথাসময়ে সুরেশবাবু সুশীলাসুন্দরীকে লইয়া 'মেয়ে' দেখিতে গেলেন। মেয়েটির নাম কমলা। বয়সের চেয়ে যেন একটু ছোট দেখিতে। মুখখানি বড় সুন্দর। মেয়ে দেখিয়া দুজনেরি বড় ভাল লাগিল। সুরেশবাবু মেয়ের জন্ম তারিখ ইত্যাদি লিখিয়া লইলেন। মণীন্দ্রের জন্ম-পত্রিকার নকল দিতে গেলে গণেশবাবু বলিলেন—আমি ঘোর অদৃষ্টবাদী। মানুষ দেখিয়া কিছু করিতে পারে সে বিশ্বাস আমার নাই।

সুরেশবাবু বলিলেন—আমার এ সবে খুব আস্থা আছে। জন্ম-পত্রিকায় যদি কোন বাধা না থাকে—আর কোন আপত্তি নেই।

ইহার পর সুরেশবাবু সুশীলাসুন্দরীকে লইয়া গৃহে ফিরিলেন। পথে আসিতে আসতে সুশীলাসুন্দরী বলিলেন, মেয়েটিকে আমার এত ভাল লেগেছিল, ইচ্ছা হচ্ছিল তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসি।

জ্যোতিষের গণনায় এ বিবাহ রাজযোটক বলিয়া স্থির হইল। কাজেই বিবাহে কোন বাধা ঘটিলনা।

বৈশাখের শেষের দিকে এক শুভদিনে বিবাহ সম্পন্ন হইল।

সুশীলাসুন্দরীর আনন্দের অবধি রহিলনা।

উষা কমলার হাত ধরিয়া সুশীলাসুন্দরীর কাছে আনিয়া বলিল—"মা কমলা আমার কথা শোনেনা।"

সুশীলাসুন্দরী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"দিদির কি কথা শোননি মা?"

কমলা বলিল—কিছু নয় মা। দিদি সেই নতুন খাবারটা কচ্ছিলেন। আমি একটু যোগাড় করে দিচ্ছিলাম ; অমনি দিদি আপনার কাছে ধরে নিয়ে এলেন।

সুশীলাসুন্দরী বলিলেন, ১৫ দিন পরে তুমি মোটে কাল ভাত খেয়েছ, আজই কেন তুমি কাজ কত্তে গেলে মা? কাজ করতে বল্লে যেমন শোনা উচিত, কাজ করতে বারণ কল্লেও তেমনি শোনা উচিত। ফের যদি অসুখে পড় তাহলে যে আরও অনেক দিন দিদিকে সাহায্য করতে পারবে না।

কমলা বলিল, একটু পড়্‌তে গেলে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন, একটু কাজে হাত দিলে দিদি রাগ করবেন। একেবারে চুপ করে কি করে থাকি মা!

কমলা একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া চুপ করিল।

উষা তাকে বুঝাইয়া বলিল,—আচ্ছা চল, তুমি আমার কাছে বসে বসে গল্প কর্‌বে।

বলিয়া যেমন আসিয়াছিল তেমনি কমলার হাত ধরিয়া ফিরিয়া গেল।

সুশীলাসুন্দরী একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন—দু'টি ছেলেকে আর দু'টি বৌকে এমনিভাবে ওঁর কাছে যেন রেখে যেতে পারি।

সেই দিন সুরেশবাবু আফিস হইতে আসিয়া বলিলেন—"আজ একটা পরামর্শ আছে।"

ইন্দুর উপর ভার পড়িল সকলকে সংবাদ দিবার। ইন্দু একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া লিখিল—

কাল—সন্ধ্যা ৬৷৷০

স্থান—হলঘর

বিষয়—পরামর্শ।

নিম্নলিখিত সভ্যগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়—

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

" মণীন্দ্র " "

শ্রীযুক্তা উষা দেবী।

" শান্তি দেবী।

" কমলা দেবী।

জ্যেঠামহাশয়ের আদেশানুসারে

ইন্দু দেবী।

পেন্‌সিল লইয়া ইন্দু সকলের সহি করাইয়া আনিল। কমলা হাসিয়াই অস্থির। বলিল—ইন্দুদিদি দস্তুর মত একটা কেরাণীণি।

উষা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—সে আবার কি?

কমলা বলিল—কেন, কেরাণী তো পুংলিঙ্গ; ওটা ধর ইন্‌ভাগান্ত শব্দ;—কাজেই স্ত্রীলিঙ্গে হ'ল কেরাণীণি।

সুশীলাসুন্দরী শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন—পাগ্‌লির সব তাতে খেলা।

সন্ধ্যায় সকলে একত্র হইলে সুরেশবাবু বলিলেন—আজকের পরামর্শে মণীর মতামতই বেশী দামী। তবু তোমাদের সবাইকে ডাকার উদ্দেশ্য, কোনটা উচিত অনুচিত সেটা হয়ত এতে সহজ হবে।

কথাটা কি জানিবার জন্য সবাই একটু উৎসুক ভাবে সুরেশবাবুর পানে চাহিল।

সুরেশবাবু বলিলেন—মণীর একটা ডেপুটিগিরি একটু চেষ্টা করলেই হ'তে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে মণীর মত লওয়া প্রয়োজন।

আমার প্রথম প্রশ্ন মণীর প্রতি—চাকরিতে তোমার কোন আপত্তি আছে কিনা?

মণীর উত্তর যেন ভাবাই ছিল। সে তৎক্ষণাৎ বলিল—চাক্‌রি নিতে আমার মোটেই ইচ্ছে নেই—তবে আপনি যদি আদেশ করেন, আমি চাকরী নেব।

সুরেশবাবু বলিলেন, না মণি, আমি এ সম্বন্ধে তোমাদের কোন আদেশ দিতে চাইনে। তবে তুমি যদি ইচ্ছা কর একটা চাকরি পেতে পার। এ সম্বন্ধে তোমার স্বাধীন ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিতে চাই, তুমি স্বেচ্ছায় যে পথে চল্‌বে, যাতে তুমি সুখী হবে তাতেই আমার আনন্দ। এখন তোমাদের সব কি মত বল।

সুশীলাসুন্দরী বলিলেন—মণী যাতে সুখী হয় তাই করুক্। ফণীরও এই মত হইল।

উষা বলিল—ঠাকুরপো ডেপুটি হন্—এই আমার ইচ্ছা। ইন্দুর মত প্রফেসর হওয়া। শান্তির মত বড় উকীল বা ব্যারিষ্টার হইয়া দেশসেবক হওয়া।

সুরেশবাবু বলিলেন, এবার ছোট বৌমার মত কি শোনা যাক্।

কমলা একটু ভাবিয়া বলিল—এখনও আমার স্বাধীন মত বলার ক্ষমতা হয়নি। এখন মায়ের যা মত আমারও তাই।

সুরেশবাবু প্রশান্ত মুখে বলিলেন—ছোট বৌমা ঠিক কথাই বলেছেন। পরে মণীন্দ্রের পানে চাহিয়া বলিলেন—তাহলে মণি! তুমি সরকারি চাক্‌রি থেকে মুক্তি পেলে।

ইন্দু সেই কাগজখানির উপর লিখিল—অধিকাংশের মতানুসারে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথকে ইচ্ছামত চলিবার অধিকার দেওয়া হইল।

কাগজখানি ইন্দু তখন সুরেশবাবুর সম্মুখে ধরিল।

সুরেশবাবু সব পড়িয়া মৃদু হাসিয়া তাহাতে সহি করিয়া দিলেন। বলিলেন—"ইন্দুমাকে যে কাজের ভার দেওয়া হয়, তা খুব শৃঙ্খলার সঙ্গে তিনি করেন। ইন্দুমা আমাদের সভার খুব ভাল সেক্রেটারী।

৩১

গৌরাঙ্গ ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া ইয়ুরোপের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানে ভ্রমণ করিতেছিল। একদিন টেলিগ্রাম আসিল, গৌরাঙ্গ দেশে যাত্রা করিয়াছে। সকলেই গৌরাঙ্গের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

স্বামীকে দূরদেশে পাঠাইয়া শান্তির ব্যাকুলতা এতদিন কেহ বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু এখন সে আর আপনাকে স্থির রাখিতে পারিল না। গভীর রাত্রে তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইত, আর নিদ্রা আসিত না। মনে হইত, সমুদ্রের মধ্য দিয়া জাহাজ ছুটিতেছে, সেই জাহাজে গৌরাঙ্গ আরোহী। বিশাল সমুদ্রের সেই তরঙ্গভঙ্গের শব্দ যেন তাহার নিদ্রাহীন কর্ণে বার বার আঘাত করিত। তাহার মনে হইত, স্থির হইয়া থাকিলে হয়ত গৌরাঙ্গের নিঃশ্বাসের শব্দ, কথার ঢেউ, তাহার অঙ্গের বাতাস এখনি আসিয়া পৌঁছিবে। শান্তি এই কয়েক দিনেই শীর্ণ হইয়া গেল। সুধু তাহার চোখদু'টিতে অপার্থিব উজ্জ্বলতা জাগিয়া উঠিল।

গৌরাঙ্গ বোম্বাই পৌঁছিয়া টেলিগ্রাম করিতে শান্তি আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না। ঊষার কাঁধে মাথা রাখিয়া সে আনন্দে কাঁদিয়া ভাসাইল।

ঊষা শান্তির চোখের জল মুছাইয়া বলিল, এখন চোখের জল মুছোবার লোক আস্‌ছে, এখন কাঁদ্‌লে লাভ বই লোক্‌সান নেই।

চোখে জল থাকিলেও শান্তির মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

গৌরাঙ্গ পূর্ব্বেই জানাইয়াছিল যে কলিকাতায় পৌঁছিয়া প্রথমে একবার পুরাতন বাসায় যাইবে যেখানে সে দীর্ঘকাল পিতামাতার সহিত বাস করিয়াছে। সেখানে পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া পরে শ্বশুর বাড়ীতে আসিবে।

ষ্টেশনে সুরেশবাবু, মণীন্দ্র ও ফণীন্দ্রের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। গৌরাঙ্গ গাড়ী হইতে নামিয়া শ্বশুরকে প্রণাম করিল। সুরেশবাবু প্রগাঢ় স্নেহে তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন। কুলি জিনিসপত্র উঠাইল; সকলে ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সুরেশবাবু বলিলেন—আমরা তাহলে তোমার জিনিসপত্র নিয়ে বাসায় যাই—তুমি নিজের বাসা ঘুরে শীঘ্র এস।

ফণীন্দ্র বলিল—আমরা যে তোমার জন্য অধীর ভাবে অপেক্ষা কর্‌ব তা বলাই বাহুল্য।

গৌরাঙ্গ বলিল—বাড়ীর চাবিটা—

ফণীন্দ্র বলিল—দরজা খোলা আছে চাকর একজনও বাইরে আছে। তুমি শীগ্‌গির যাও।

সুরেশবাবুরা আপনাদের গাড়ীতে উঠিলেন। গৌরাঙ্গ অপর একখানি গাড়ীতে উঠিয়া সুকিয়া ষ্ট্রীটের পথে চালাইতে বলিল। পরিচিত গলিটির সম্মুখে গাড়ী থামিতে গৌরাঙ্গ নামিয়া গাড়ীর ভাড়া মিটাইয়া দিল ও গলির ভিতর প্রবেশ করিল।

বাড়ীর দরজা খোলা সেখানে একটি ভৃত্য প্রহরী স্বরূপ দাঁড়াইয়া। গৌরাঙ্গকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি পথ ছাড়িয়া দিল। গৌরাঙ্গ ৩ বৎসর

পরে তাহার গৃহে প্রবেশ করিল। প্রথমেই সেই বাহিরের ঘর, যেখান হইতে সেদিন তাহার দেবোপম পিতাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল ; তাহার পরই তাহার পড়িবার ঘর যেখানে তাহার মাতা তাহার পিতার দ্বিতীয়বার কারাবাসের আশঙ্কায় অকস্মাৎ দেহত্যাগ করিলেন। কক্ষ পার হইয়া গৌরাঙ্গ সজলনেত্রে অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল। অঙ্গন, কক্ষ সমস্ত সুন্দর ভাবে পরিষ্কৃত—কোথাও একটু অপরিচ্ছন্নতার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। কেহ যেন অতি যত্নে প্রতিদিন ইহাকে পরিচ্ছন্ন রাখিয়াছে।

অঙ্গনে জুতা খুলিয়া রাখিয়া পিতামাতার চিত্র যে কক্ষে থাকিত, গৌরাঙ্গ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

গৌরাঙ্গ ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতামাতার উদ্দেশে প্রণাম করিল। দুই চক্ষে অশ্রুধারা বহিল।

চক্ষু মুছিতে মুছিতে গৌরাঙ্গ অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইতে শান্তি অকস্মাৎ নত হইয়া প্রণাম করিয়া গৌরাঙ্গের সম্মুখে দাঁড়াইল।

গৌরাঙ্গ বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া কিছুক্ষণ শান্তির মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"তুমি কখন্ এলে ?"

শান্তি মৃদুস্বরে বলিল—আমি সকাল থেকে এখানে আছি ; আর সেই থেকে কেবল ভাব্‌ছি— এই তুমি এলে !

পরক্ষণে দীর্ঘ অদর্শনের পর—উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইল।

৩২

গৌরাঙ্গ সুদূর প্রবাস হইতে কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সুশীলাসুন্দরীর দুর্ভাবনা দূর হইয়াছে।

সুরেশবাবু দেখিলেন কমলার পিতামাতার সহিত গৌরাঙ্গের পরিচয় হয় নাই, এই উপলক্ষ্যে পরিচয়াদিও হইয়া যাইবে। সেজন্য নিতান্ত আত্মীয় ব্যতীত বাহিরের কাহাকেও বলা হইল না। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কমলার পিতামাতাকে আহ্বান করিয়া আনা হইল।

ইন্দু ও কমলায় বড় ভাব। যাঁহার যাহা দরকার, দুইজনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাই যোগাইতে লাগিল।

মণীন্দ্রের শ্বশুর গণেশবাবু কয়েকবার ইন্দুর পানে চাহিয়া দেখিলেন। কেবলি তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন ওই মেয়েটি তাঁহার বড় পরিচিত —কোথাও যেন দেখিয়াছেন। সহসা একটা কথা বিদ্যুতের মত তাঁহার মনে হইল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন। আবার ভাবিলেন, না তাহা সম্ভব নহে। কিন্তু যদি হয়?—একবার সন্ধান লইতে হইবে। তিনি সে চিন্তাকে আর মনোমধ্যে স্থান দিলেন না।

জলযোগাদির পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল মণীন্দ্রকে গান গাহিতে হইবে। মণীন্দ্রের শ্বশুরেরই গান শুনিবার বেশী আগ্রহ; কারণ গানের মধ্য দিয়াই তাঁহার জামাতার সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয়।

অতি সুকণ্ঠ হইলেও গান গাহিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করা বা অনর্থক দেরী করা মণীন্দ্রের স্বভাববিরুদ্ধ। সে সুধু বলিল—"আমি কিন্তু 'স্বদেশী' গান গাইব।" কেহ কিছু বলিবার আগে মণীন্দ্রের শ্বশুর বলিলেন—

"নিশ্চয়। আমি তোমার কাছে স্বদেশী গানই শুন্‌তে চাই। তুমি সেই গানটা একবার গাও তো বাবা—

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্
জগতজনের শ্রবণ জুড়াক্।

এ গান কখনো পুরাণো হয় না।"

মণীন্দ্র বিনা আপত্তিতে উঠিয়া হারমনিয়মের কাছে আসিয়া বসিল। একটিবার চক্ষু মুদিয়া যেন সেই কবি বর্ণিত জনসঙ্ঘের মধ্যে আপনাকে লইয়া গেল যেখানে কবি সকলকে বলিতেছেন—তোমরা আলস্য পরিহার করিয়া একবার উঠ; ভাইকে ভাই বলিয়া চেন; মাকে মা বলিয়া ডাকিতে শিখ। তাহা হইলে তোমাদের সকল দুঃখের অবসান হইবে, সকল দুঃখ দূর হইবে, জগতে তোমাদের স্থান হইবে।

তারপর মণীন্দ্র গাহিল :—

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্
জগতজনের শ্রবণ জুড়াক্,
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক্,
মুখ তুলে আজি চাহরে।
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজুলি,
প্রভাত গগনে কোটি শির তুলি
নির্ভয়ে আজি গাহরে।
বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে,
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘিরিলে
দশদিক্ সুখে হাসিবে।

সেদিন প্রভাতে নূতন তপন,
নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন,
আসিবে সেদিন আসিবে।
আপনার মায়ে মা বলে ডাকিলে,
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে
পুণ্য প্রেমের বাতাসে।
সেথায় বিরাজে দেব-আশীর্ব্বাদ,
না থাকে কলহ, না থাকে বিবাদ,
ঘুচে অপমান. জেগে ওঠে প্রাণ,
বিমল প্রতিভা বিকাশে।

সমস্ত প্রাণ দিয়া মণীন্দ্র এগান গাহিয়া গেল। ছেলে যাকে মা বলিয়া ডাকে নাই, মা বলিয়া চিনে নাই, সে দুঃখ মায়ের প্রাণে হিমাদ্রি পাষাণের মত জাগিয়া আছে। একবার মা ডাক্ শুনিবামাত্র সে দুঃখের পাষাণ-অশ্রুজলে গলিয়া যাইবে; মায়ের চক্ষে আনন্দের শতদল ফুটিয়া উঠিবে।

এই চিত্রটি সবারি চক্ষের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

যখন গান শেষ হইল সকলেরই চক্ষু তখন অশ্রুভরা। ক্ষণকালের জন্য যেন সকলে স্বর্গলোকে প্রবেশের অধিকার পাইয়া মুগ্ধ নয়নে সেখানকার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া লইয়াছিল।

গৌরাঙ্গ বলিল—মণি, সার্থক গান শিখিয়াছিলে!

তখন পিতা মাতা শ্বশুর সকলেই কাছে গিয়া তাহাকে অভিনন্দিত করিল।

কমলা পর্য্যন্ত আগাইয়া গিয়াছিল। মুখে কিছু না বলিলেও তাহার আনন্দবিকশিতচক্ষের প্রশংসার বাণী কাহারও অজ্ঞাত রহিল না।

ইন্দুও সব শেষে উঠিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু মুখে কোন কথা ফুটে নাই।

তারপর আহারের আহ্বান। একে একে সকলেই আহারে বসিলেন। বসিল না কেবল ইন্দু। সঙ্গীতের আবেশ এখনও তাহার মন হইতে দূর হয় নাই। অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করিয়া সে শুইয়া পড়িল। শুধু সুশীলা-সুন্দরীর কাছে বলিয়া গেল সে খাইবে না, বুক কেমন করিতেছে।

আহারাদি মিটিয়া গেল। অতিথিরা সবাই বিদায় লইল। বাড়ীর সকলে আপন আপন কক্ষে শয়ন করিতে গেল।

অনেক রাত্রে সুশীলাসুন্দরীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে তাঁহার ইন্দুর কথা মনে পড়িল। ইন্দু কেমন আছে দেখিবার জন্য তিনি ধীরে ধীরে আপনার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া ইন্দুর কক্ষে গেলেন। দেখিলেন, ঘরে আলো জ্বলিতেছে, কিন্তু ইন্দু শয্যায় নাই।

তবে কি সে ভুলক্রমে হলঘরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে? ব্যস্ত হইয়া তিনি হলঘরের দিকে চাহিলেন। ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময়ে সেই কক্ষের উজ্জ্বল আলোকে দেখিলেন, যে আসনে মণীন্দ্র বসিয়াছিল, সেই আসনখানি দুই হাতে বুকে জড়াইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

তাঁহার আর বুঝিতে কিছু বাকি রহিল না। ইন্দুর মনের গোপন কথাটা মুহূর্ত্তে তাঁহার কাছে বিদ্যুতালোকে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তখনি তিনি ফিরিয়া গেলেন। গভীর দুঃখে ও ব্যর্থ শোকের তপস্যা ভাঙ্গিতে সাহস হইল না।

হায় অভাগিনী পিতৃমাতৃহীনা, কেন এমন করিয়া মণীন্দ্রকে ভালবাসিলি? ভালবাসিলি তো আগে কেন একটিবার ঘুণাক্ষরেও জানিতে দিলিনা?

কথাটা সুশীলাসুন্দরী অতি গোপনে স্বামীকে বলিলেন। দু'জনে চিন্তান্বিতচিত্তে কিছুক্ষণ পরামর্শ করিলেন।

পরদিন সুশীলাসুন্দরী বাড়ীতে ইচ্ছা করিয়াই রাষ্ট্র করিয়া দিলেন, এবার ইন্দুর বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে।

শুনিয়া কমলা আনন্দে অধীর হইয়া পড়িল; ইন্দু বড়ই গম্ভীর হইল।

মাস তিনেক পরেই ইন্দু ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিল। এবার ইন্দু সুশীলাসুন্দরীকে বলিল—আমি এখন পড়্‌ব মা।

সুশীলাসুন্দরী ইন্দুর চিবুকে হাতদিয়া আদর করিয়া বলিলেন—"এখন যে পরের ঘরে যাবার সময় হয়ে এল মা; আর বেশী দিন রাখ্‌তে পারব না। এবার থেকে ঘরে বসে পড় মা।"

ইন্দু কাতর হইয়া বলিল—আমাকে আই-এ পর্য্যন্ত পড়্‌তে দিন্ মা—আপনার পায়ে পড়ি।

সুশীলাসুন্দরী বলিলেন—কি কর্‌ব মা—ওঁর ইচ্ছা যে বিয়েটা শীঘ্র হয়ে যায়। উনি বল্‌ছিলেন, ইন্দুর বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত ওঁর একটা মস্ত কর্ত্তব্য বাকি থাক্‌বে।

ইন্দু এবার কাঁদকাঁদ হইয়া বলিল—আপনি একটু ভালকরে বলুন মা তাহলে জ্যাঠামশায় আপত্তি করবেন না।

ইন্দু সুরেশবাবুকে জ্যাঠামশায় বলিত, কিন্তু সুশীলাসুন্দরীকে জ্যাঠাইমা না বলিয়া 'মা' বলিত।

ইন্দু পড়িবার অনুমতি পাইয়া আই-এ পড়িতে লাগিল।

বিবাহ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেও ইন্দু মুখ ফুটিয়া সে

কথা কাহাকেও বলিতে পারিল না, পাছে তাহার মনের গোপন কথা কেহ ধরিয়া ফেলে। সুশীলাসুন্দরী যে তাহাকে সে রাত্রে মণীন্দ্রের আসনে লুটাইয়া কাঁদিতে দেখিয়াছিলেন সে কথা সে মোটেই জানিতে পারে নাই ; পারিলে সে কি করিত বলা যায় না।

ভাবিয়া ভাবিয়া ইন্দু এক উপায় স্থির করিল ও তাহাই অবলম্বন করিল। সে খুব মন দিয়া পড়িতে লাগিল। কলেজে শীঘ্রই তাহার সুনাম হইল। বাড়ীতেও সকলে তাহার পাঠানুরাগ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল। যাহারই অবসর দেখিত, তাহারই নিকট হইতে পুস্তকের কঠিন অংশ বুঝাইয়া লইত। যে লেখকের একখানি পুস্তক পড়িবার কথা, বাড়ীর লাইব্রেরী হইতে লইয়া সেই লেখকের ৩।৪ খানি পুস্তক সে পড়িয়া ফেলিল। মাস কয়েকের মধ্যেই ইন্দুর তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ফণীন্দ্র চমৎকৃত হইল।

ইন্দুর বিবাহের চেষ্টা দেখিয়া ফণীন্দ্র একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পিতাকে বলিল—"আই-এটা পাশ করার পর ইন্দুর বিবাহ দিলে ভাল হয়না বাবা ?"

মণীন্দ্রও মাঝে মাঝে ইন্দুকে পাঠ বুঝাইয়া দিত। যে সময়ে মণীন্দ্র তাহাকে পড়াইত ইন্দু তাহার মুখের পানে চাহিয়া তন্ময় হইয়া পড়া শুনিত। পাঠ্য বিষয়ের চেয়ে মণীন্দ্রের কণ্ঠস্বর, তাহার বলিবার ভঙ্গী, সর্ব্বোপরি মণীন্দ্রের সান্নিধ্য ইন্দুর কাছে বহুগুণে প্রিয়তর বলিয়া মনে হইত। অধিক রাত্রে একা ঘরে বসিয়া পড়িবার সময়ে তাহার মনে হইত, চিরকাল পড়িবার অধিকার ও মণীন্দ্রের সান্নিধ্য—এই দু'টি পাইলেই সে জীবনটা একরকমে কাটাইয়া দিতে পারে। সে আর কিছুই চাহে না।

কিন্তু সত্যই কি সে আর কিছু চায় না ? মণীন্দ্রের দিকে চাহিয়া মণীন্দ্রের কথা ভাবিয়া, কমলার প্রতি মণীন্দ্রের অনুরাগের কথা কমলার মুখে শুনিয়া তাহার প্রাণ এক একবার হাহাকার করিয়া উঠিত।

কমলার পিতা এক সন্ধ্যায় কমলাকে দেখিতে আসিলেন। সুরেশবাবু তখন বাড়ীতেই। কন্যার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার পর তিনি সুরেশবাবুর কাছে আসিয়া বসিলেন। দুই বৈবাহিককে কথা হইতে লাগিল।

সুরেশবাবু। আমার ইন্দুমার এবার একটা সম্বন্ধ দেখ্‌তে হবে এবার—

গণেশবাবু। বেশ ; ইন্দুর সঙ্গে আপনার ঠিক সম্পর্কটা কি ?

সুরেশবাবু। ওঃ সে কথা বুঝি আপনাকে বলাই হয়নি। তবে শুনুন্। ইন্দুর সঙ্গে ঠিক কোন সম্পর্কই নেই। ওটি আমার পালিতা কন্যা—অবশ্য ব্রাহ্মণ কন্যা।

গণেশবাবু। ইন্দুর বাপের নাম কি ?

সুরেশবাবু। সঞ্জীব রায়।

গণেশবাবু। রায় ? সঞ্জীবচন্দ্র রায় ?

সুরেশবাবু। হঁ্যা—কেন আপনি কি চেনেন ?

গণেশবাবু। না, ঠিক চিনিনে,—তবে নামটা যেন জানা মনে হচ্ছে।

সুরেশবাবু। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাই সঞ্জীবচন্দ্র—সেই হিসাবে নামটা বোধহয় জানা মনে হচ্ছে।

গণেশবাবু। হবে। আচ্ছা, মেয়েটিকে কোথায় পান্ ?

সুরেশবাবু। মেহেরপুরে।

সুরেশবাবু তখন ইন্দুকে পাওয়ার ইতিহাস সংক্ষেপে বলিলেন।

গণেশবাবু কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—সঞ্জীবের পিতার নাম জান্‌তে পেরেছিলেন কি ?

সুরেশবাবু। না, তা পারিনি ; তবে এইটুকু জান্‌তে পেরেছিলাম যে, সঞ্জীবের বাপ খুব বড় জমীদারের ছেলে ছিলেন, বাপের অজ্ঞাতসারে সঞ্জীবের মাকে বিবাহ করেছিলেন ; পরে সম্ভবতঃ সে বিবাহ গোপন রেখে পুনরায় বিবাহ কর্‌তে বাধ্য হন্। দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেরাই হয়ত সব

ভোগ দখল করছে। আর সঞ্জীব বেচারা ভিখারীর চেয়েও কষ্টে দিন কাটিয়েছে। ওঃ সঞ্জীব যে ডায়েরি রেখে গেছে—তা পড়্‌তে শত্রুর চোখেও জল আসে।

আপনাকে যেন বড় অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। শরীর ভাল তো?

গণেশবাবু। না, শরীরটা ক'দিন থেকে খারাপ যাচ্ছে,—আজ আরও খারাপ, এখন তবে উঠি।

সুরেশবাবু। আসুন তবে। আমিই একদিন যাব শীগ্‌গির। মেয়েটির জন্য একটি ভাল পাত্র সন্ধান করবেন যেন।

গণেশবাবু। হ্যাঁ, করব; যথাসাধ্যই করব।

কথাবার্ত্তার পর গণেশবাবু অত্যন্ত চিন্তান্বিতভাবে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

৩৪

পরদিন প্রভাতেই বৈবাহিকের বাড়ী হইতে একখানি পত্র লইয়া একজন প্রৌঢ় কর্ম্মচারী আসিলেন। যদি অসুবিধা না হয়, সকালেই একবার কমলাকে পাঠাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন আর লিখিয়াছেন রাত্রি হইতে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন সে জন্য নিজে আসিতে পারিলেন না।

সুরেশবাবু কর্ম্মচারীকে বলিয়া দিলেন—আপনি গিয়া বলুন ঘণ্টা-খানাকের মধ্যে মণী বৌমাকে নিয়ে যাচ্ছেন। পিতার আদেশে মণীন্দ্র কমলাকে শ্বশুর বাড়ী পৌঁছাইয়া শ্বশুরের কাছে খানিকক্ষণ বসিয়া ফিরিয়া আসিল।

সন্ধ্যায় সুরেশবাবু স্বয়ং বৈবাহিককে দেখিতে আসিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়াই সুরেশবাবু চমকিয়া বলিলেন—এ কি! একদিনে আপনার চেহারা কি হয়ে গেছে।

গণেশবাবু ম্লান হাসিয়া বলিলেন—বসুন, তাই তো আপনাকে ডেকেছি।

সুরেশবাবু একটু বিস্মিতভাবে বৈবাহিকের পানে চাহিয়া বসিলেন।

গণেশবাবু বলিতে লাগিলেন—

টাকিতে আমি আর সদানন্দ বরাবর একসঙ্গে পড়েছি, যদিও আমি সদানন্দের চেয়ে বছর কয়েকের ছোট ছিলাম। একই বছরে দু'জনে এনট্রান্স পাশ করি। সদানন্দ বিখ্যাত জমীদার ভুবন বাঁড়ুয্যের একমাত্র ছেলে। আমি সামান্য গৃহস্থের ছেলে মাত্র। কল্‌কাতায় রেখে কলেজে পড়াবার ক্ষমতা আমার বাবার ছিলনা। সদানন্দের চেষ্টায় তার সঙ্গে কল্‌কাতায় এক বাসায় থেকে আমার কলেজে পড়্‌বার ব্যবস্থা হ'ল।

আমি গরীবের ছেলে, পড়্‌বার সুযোগ পেয়ে সুধু সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছি। অন্যদিকে চেয়ে দেখ্‌বার অবসর পাইনি। সদানন্দ বড় লোকের ছেলে—সুধু পড়া নিয়ে থাক্‌ত না, গান বাজনা করা, বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী যাওয়া আসা এ সবই তার ছিল। তা বলে সে পড়াতে আমার চেয়ে বিশেষ কম যেতনা।

এফ-এ পাশ করার পর দু'জনে বি-এ পড়্‌ছি তখন। এক রাত্রে সদানন্দ বাড়ী এলনা। রাত্রে সে কখনও বাইরে থাকৃত না, চরিত্রও তার নিষ্কলঙ্ক ছিল। আমি একটু ভাবিত হ'লাম। পরদিন সকালে সদানন্দ ফির্‌ল। তাকে একটু চিন্তিত মনে হ'ল। কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই সদানন্দ আমাকে নির্জ্জনে ডেকে বল্‌লেন—"গণেশ, কাল রাতে আমি বিবাহ করেছি।"

সে কি! আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম! তখন সদানন্দ

সংক্ষেপে বল্‌লে, ক্লাসের একটি ছেলের বাড়ীতে সে মাঝে মাঝে যেত। তার দূর সম্পর্কের একটি ভাইঝি তার বিধবা মায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাদের বাড়ী আস্‌ত। মেয়েটি বড় সুন্দর ও শান্ত, বাপের কাছে বেশ লেখাপড়াও শিখেছিল। বিবাহ-যোগ্য বয়স হলেও পয়সা অভাবে মেয়েটির বিবাহ হচ্ছিল না। মেয়েটির মা এ কথা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে সদানন্দের কাছে বলেছিলেন। মেয়েটির মায়ের অশ্রুজল ও মেয়েটির সুন্দর মুখ সদানন্দকে এতই বিচলিত করেছিল যে মেয়েটিকে বিবাহ না করে সে পারেনি।

আমি সমস্ত শুনে সভয়ে বল্‌লাম—বিবাহ তো করেছ—তারপর? জ্যাঠামশায় শুন্‌লে কি বল্‌বেন?

জ্যাঠামশায় হচ্ছেন সদানন্দের বাবা। তিনি যে রকম গম্ভীর ও একরোখা মানুষ,—এ খবর শুনে যে কি করবেন তাই হ'ল আমার সব চেয়ে ভয়ের বিষয়।

তখন দু'জনে মিলে পরামর্শ করে স্থির করলাম, এ বিবাহের কথা এখন কিছুতেই তাঁকে জান্‌তে দেওয়া হবেনা। তারপর সুবিধা বুঝে তাঁকে জানানো হবে। বেলঘরের কাছে নিমতিতা গ্রামে মেয়েটির বাপের বাড়ী। সংসার তাদের অতিকষ্টে চলে। কল্‌কাতার বাসায় খরচ থেকে বাঁচিয়ে নিয়মিতভাবে তাঁদের কিছু দিতে হবে। আমরা এই ভাবেই চল্‌তে লাগ্‌লাম। সদানন্দ মাঝে মাঝে নিমতিতা যেত। কখন বা দুপুরে গিয়ে রাত্রে ফির্‌ত, কখন বা রাত্রে গিয়ে সকালে আস্‌ত। জ্যাঠামশায় কখন কখন অতর্কিতভাবে কল্‌কাতা এসে পড়্‌তেন; আসার উদ্দেশ্য ছিল, আমরা কি ভাবে চল্‌ছি তাই দেখা। টাকীর দুই একজন লোককে আমরা বলে রেখেছিলাম, উনি আস্‌বার আগে যেন আমরা খবর পাই। তা হলেও কিন্তু আমাদের নিশ্চিন্ত হবার যো ছিলনা। কারণ, এমনও

মাঝে মাঝে ঘটত, পত্র পেলাম ৭ দিন পরে তিনি আসবেন—অথচ এলেন পত্র পাবার একদিন পরেই !

যে বছর আমরা বি-এ, পাশ করি, সেই বছরেই সদানন্দের একটি পুত্র জন্মে। যথাসময়ে ছেলেটির নাম রাখা হ'ল। সঞ্জীবনাথ আমিই রাখতে বলি। তখন আমরা বি-এল্ পড়ি। বি-এল পরীক্ষা হতে মাস ছয় দেরী আছে এমন সময় একদিন আমরা খবর পেলাম, বিবাহের গুজব তাঁর কাণে গিয়াছে এবং শীঘ্রই অনুসন্ধানের জন্য কাউকে এখানে পাঠানো হবে।

তাঁর ক্রোধ ও সেই ক্রোধের ফল আমাদের খুব ভালই জানা ছিল। সদানন্দ তো ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ল। দুজনেরই মনে হ'ল—নিমতিতা কলকাতা থেকে বেশী দূর নয় সেখানে খোঁজ নিতে যাতায়াত বিচিত্র নয়। সদানন্দ সেই রাত্রেই নিমতিতা চলে গেল। তার পরের দিন সন্ধ্যার পর সে অত্যন্ত ক্লান্ত ও ম্রিয়মাণ হয়ে ফিরে এল। শুনলাম তাঁদের সব মেহেরপুরে রেখে এসেছে। মেহেরপুর সদানন্দের স্ত্রীর মামার বাড়ী।

তার এক সপ্তাহ পরে সদানন্দের উপর হঠাৎ আদেশ এল বাড়ী ফিরে যেতে। আইন অধ্যয়ন অসমাপ্ত রেখেই তাকে যেতে হল। জ্যাঠামশায় এমন ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন যে বাড়ী পৌছুবার পরদিনই তাকে পুনরায় বিবাহ করতে হয়। আগের বিবাহের কথা প্রকাশ করে বলবার সুযোগ ও সাহস তার হয়নি। সেই থেকে সদানন্দের পাঠদ্দশার শেষ হয়।

পড়বার সময়ে কিছু টাকা তার আমার কাছে জমা ছিল। তারপর সুযোগ পেলেই কিছু কিছু টাকা আমার কাছে লোকের হাত দিয়ে সে পাঠিয়ে দিত। আমাকে সে ঠিকানা দিয়ে গিয়েছিল, সেই ঠিকানায় মাসে মাসে টাকা আমিই পাঠিয়ে দিতাম। উকীল হয়ে আমি দেশে এসে বসি ; তারপর কিছু পসার হলে তবে আমি বিবাহ করি। তখনও আমার হাত দিয়ে টাকা যেত।

সদানন্দের মা বাল্যকালেই মারা যান্—তা নইলে মায়ের মুখ দিয়ে বাপকে বিবাহের কথাটা হয়ত সে বল্‌তেও পার্‌ত। পূর্ব্ব বিবাহের কথা বাবাকে বলবার জন্য সদানন্দ মাঝে মাঝে অধীর হয়ে উঠ্‌ত; কিন্তু একটা না একটা ব্যাঘাত ঘটায় সে কথা আর বলা হ'ল না। এইভাবে বোধ হয় ১০।১২ বৎসর কেটে যায়।

এই সময়ে জ্যাঠামশায় জ্বরাতিসারে মরণাপন্ন হন্। রোগ থেকে অতি কষ্টে রক্ষা পেয়ে তাঁর তীর্থভ্রমণের সাধ হ'ল। সদানন্দ তার স্ত্রী এবং দুচার জন লোক সঙ্গে নিয়ে তিনি বা'র হন্।

তখন পূজার ছুটিতে কোর্ট বন্ধ—আমি সস্ত্রীক পুরী চলে গেছি। যাবার আগে আমি সদানন্দকে বলে যাই, সে যেন যথাসময়ে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করে। সেও বলে, তুমি আর কতদিন এভার বইবে; আমি এর ব্যবস্থা কর্‌ব।

মফস্বলের একজন কর্ম্মচারীর হাতে সে কিছু টাকা ও ঠিকানা রেখে দিয়ে ও বলে যায় যেন নিয়মিত ভাবে টাকা পাঠানো হয়। দরকার হলে ম্যানেজারের কাছে এসে সে যেন টাকা নিয়ে যায়। ম্যানেজারকেও সে ঐ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিয়ে যায়।

নানা তীর্থে ঘুরে কাশী এসে জ্যাঠামশায় কিছুকাল বাস করেন। সেখানে হঠাৎ কলেরায় আক্রান্ত হয়ে জ্যাঠামশায় ও সদানন্দের স্ত্রী দুজনেই মারা যান্। বৎসর দেড়েক পরে সদানন্দ একা দেশে ফিরে এল। তখন সে বিস্তীর্ণ জমিদারীর একমাত্র মালিক।

শ্রাদ্ধাদি শেষ হলে সদানন্দ সে কর্ম্মচারীকে ডেকে পাঠালে। তার কথাবার্ত্তায় কেমন তার প্রতি সদানন্দের সন্দেহ হ'ল। এ পর্য্যন্ত কত টাকা পাঠিয়েছে তার হিসাব এ টাকা পাঠানোর রসীদ দেখ্‌তে চাইলে কর্ম্মচারী তা দেখাতে পারলে না। ডাক ঘরে খবর

নিতে জানা গেল, মাত্র ছমাস সে নিয়মিতভাবে টাকা পাঠিয়েছিল—তারপর একবারে বন্ধ। অথচ তার নাম করে ম্যানেজারের কাছ থেকেও মাসে মাসে সে টাকা নিয়ে গেছে! খুব উদ্বিগ্ন হয়ে সদানন্দ টেলিগ্রাফে ১০০৲ টাকা তখনি পাঠিয়ে দিলে, টাকা ফিরে এল। তার নিজের যেতে সাহস হ'লনা, তাই একজন কর্ম্মচারীকে সে পাঠিয়ে দিলে খবর নিয়ে আস্‌তে। দিন দুই পরে সে খবর নিয়ে এল—সঞ্জীব রায়ের মা মারা গেছেন এক প্রকার অনাহারে, সঞ্জীব মারা গেছে জেলে, সঞ্জীবের স্ত্রী জলে ডুবে মারা গেছে; সঞ্জীবের একটি মেয়ে ছিল, তাকে কে নিয়ে গেছে—কোন অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, কি মারা গেছে, কেউ জানেনা।

খবর শুনে সদানন্দ এত মুষ্‌ড়ে গেল যে, কিছুকাল সে কারও সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কইলে না। অনেক দিন পরে সে আমাকে ডেকে পাঠালে ও তার ষ্টেটে আমাকে প্রধান ম্যানেজার করে রাখ্‌লে। সঞ্জীবের মেয়ের খোঁজ করার কথা বল্‌লে সে ম্লান হেসে বলত—তাকে যদি পাবার হ'ত, এমন কখন হয়। স্ত্রী মারা গেছে অনাহারে, পুত্র মারা গেল জেলে, পুত্রবধূ উদ্বন্ধনে, পৌত্রী হয়ত মারা গেছে না হয় কোন অনাথাশ্রমে; কোন মুখে খোঁজ নেব?

আমারও বিশ্বাস হয়েছিল সে হয়ত অনাথাশ্রমেই আছে। গোপনে খোঁজও করেছিলাম—কিন্তু কোনও খোঁজ পাইনি।

সদানন্দের মনে বড়ই আঘাত লেগেছিল। কতবার আমার কাছে সে দুঃখ করেছে যে তার পাপের ফল সে আজ ভোগ করছে। বিষয় সম্পদ্ থেকে বঞ্চিত হবার ভয়ে—সে বাপের কাছে বিবাহের কথা বলেনি, স্ত্রী পুত্রকে অনাহারে হত্যা করেছে—আজ তাই অগাধ সম্পত্তি পেয়েও সে নিঃস ও সর্ব্বরিক্ত।

সদানন্দ প্রায়ই বল্‌ত সে আর বেশী দিন বাঁচবেনা। বেঁচে থাক্‌তেই

সে কিছু সম্পত্তি লোক হিতার্থে দিয়ে যায় এবং তার বাকি সমস্ত সম্পত্তির ট্রাষ্টি সে আমাকেই নিযুক্ত করে। সদানন্দ একটা উইলও করে যে তার মৃত পুত্রের কোন সন্তান-সন্ততি যদি পাওয়া যায় সেই অর্দ্ধেক সম্পত্তি পাবে—বাকি অর্দ্ধেক আমিই পাব। সে উইলে ইহারও উল্লেখ থাকে যে যদি তার মৃত পুত্রের সন্তান সন্ততির কোন সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত সম্পত্তি আমারই হইবে।

মরবার একদিন আগে সদানন্দ আমাকে ডেকে বল্লে—গণেশ, আমি ত চল্লাম। সঞ্জীবের মেয়ে হয়ত বেঁচে থাক্‌তেও পারে। আমি দারুণ ক্ষোভে ও লজ্জায় সে সন্ধান ভাল করে নিতে পারিনি, তুমি তা নিও। তারপর উইল রইল।

পরদিনই সদানন্দ মারা গেল।

৩৫

সুরেশবাবু এতক্ষণ চিত্রার্পিতের মত বসিয়া অবাক্ বিস্ময়ে ইন্দুর পিতামহের কথা শুনিতেছিলেন। গণেশবাবু ক্ষণকালের জন্য চুপ করিলে তবে যেন তাঁহার জ্ঞান হইল।

একটু থামিয়া গণেশবাবু আবার আরম্ভ করিলেন—এবার যেটুকু বল্‌ব তা আমারই কলঙ্কের কথা। সদানন্দ মারা গেলে কিছুদিন আমি সঞ্জীবের মেয়ের জন্য ২।১ স্থানে সত্যই খোঁজ করেছিলাম। কিন্তু কোন খোঁজ পাইনি। শেষের দিকে খোঁজ নিতে যেন একটু ভয় ভয় কর্‌ত।

পূর্ব্বেই বলেছি আমি সদানন্দের চেয়ে বছর কয়েকের ছোট ছিলাম; তারপর বিয়েও করেছিলেম অনেক দেরীতে। বছর দশেকের মধ্যে আমাদের কোন সন্তানাদি হয়নি। সন্তানের আশা একপ্রকার ছেড়েই

দিয়েছিলাম এমন সময় আমাদের একটি কন্যা জন্মে। সেই কমলা—আমাদের একমাত্র সন্তান। যখন কমলা জন্মায় আমার স্ত্রীর বয়স তখন প্রায় পঁচিশ হবে। কাজেই কমলার উপর টান স্বভাবতঃই আমার বেশী হয়েছিল।

সঞ্জীবের মেয়ের কোন সন্ধান না পেলে সমস্ত সম্পত্তিই আমার কমলা পাবে—এই উইলের সর্ত্ত। সন্ধান পেলে কমলা অর্দ্ধেক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে—ক্রমশঃ কথাটা এইভাবেই আমার মনে উদয় হতে লাগ্‌ল। মানুষের লোভ এমনি ভীষণ, যে সম্পত্তি আমি এখন ভোগ কর্‌ছি তার কুড়ি ভাগের এক ভাগ পেলেই ওকালতীর সময়েও আমি আপনাকে অসীম সৌভাগ্যবান্ জ্ঞান কর্‌তাম ; আর এখন সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধেক পেয়েও আমি সুখী নই। শেষে এমন হ'ল—অপরিচিত লোক হঠাৎ কাছে এলে মনে ভয় হ'ত বুঝি বা সঞ্জীবের মেয়ের সংবাদ নিয়ে এল। ক্রমশঃ সে ভাব দূর হ'ল। চার পাঁচ বছরের মধ্যেও কোন সংবাদ না পেয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম যে সে বেঁচে নেই। সমস্ত সম্পত্তিই আমার এই সিদ্ধান্তই হয়ে রইল।

ইন্দুকে দেখে অবধি আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ইন্দুর মুখের ভাব অবিকল সদানন্দের মত। তাই প্রথম দিনই ইন্দুকে দেখে আমি চম্‌কে উঠি। কাল হঠাৎ আপনার মুখে ইন্দুর বাপের পরিচয় পেয়ে আমি নিঃসন্দেহে বুঝলাম এই সঞ্জীবের মেয়ে।

রাত্রে বাড়ী ফিরে এসে সমস্ত রাত্রি ভেবেছি কি করি। শেষে সাব্যস্ত কর্‌লাম—এতদিন কমলা জেনে এসেছে সেই সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী ; তাকে একবার কথাটা জানান প্রয়োজন।

কমলা এলে তাকে সমস্ত কথা খুলে বলে তার মত জিজ্ঞাসা কর্‌লাম। তার চোখদু'টি জলে ভরে এল। চোখ মুছে বল্লে—আহা,

ইন্দু ঠাকুরঝি এতবড় লোকের পৌত্রী হয়ে কতকষ্ট পেয়েছে! আমার শ্বশুর যদি তাঁকে আশ্রয় না দিতেন তাহলে তার কি দশা হ'ত! আপনার হাত থেকে যদি সব বিষয় চলে যায় তবু আপনি ইন্দু-ঠাকুরঝির প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করুন।

মানুষ যত বেশী পায় ততই তার লোভ বেড়ে যায়। গরীব ছিলাম, একদিন কিন্তু সম্পত্তি হাতে পেয়ে তার অৰ্দ্ধেক ছেড়ে দিতে মন সর্‌ছিল না। কমলার কথায় আমার মনে আর দ্বিধা রইলনা। এখন আপনি ইন্দুর অভিভাবক, ইন্দুর সম্পত্তি দিয়ে ইন্দুকে দিয়ে আমাকে দায়মুক্ত করুণ, আর আমার পাপ ও দুর্ব্বলতা ক্ষমা করুন।

সব শুনিয়া সুরেশবাবু বলিলেন—মানুষ দুর্ব্বল। এ দুর্ব্বলতা যে শেষে আপনি জয় করেছেন, এতেই আপনার যা অন্যায় ছিল তা ধুয়ে মুছে গেছে। ছোটবৌমা যে একথা বলেছেন, শুনে আমি বড় আনন্দ পেলাম, তাঁর উপযুক্ত কথাই তিনি বলেছেন।

কিছুক্ষণ পরে সুরেশবাবু কমলাকে সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন। পথে কমলাকে তিনি বলিলেন—মা, তুমি তোমার বাবাকে যে কথা বলেছ, শুনে আমি বড় সুখী হয়েছি। তুমি প্রকৃতই বড় ঘরের মেয়ে। অনেক ভাগ্যে আমি এমন মা পেয়েছি। এখন আর ইন্দুকে এসব বলে কাজ নেই। আমি যথাসময়ে যে রকমে বলা উচিত তাই বলব।

কমলা বলিল—হ্যাঁ বাবা, তাই বল্‌বেন।

বলিতে বলিতে গাড়ী বাসার সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল।

জ্যাঠামশায় আমাকে ডেকেছেন ?

ইন্দু কলেজ হইতে ফিরিবার একটু পরে সুরেশ বাবুর সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল। সুশীলাসুন্দরীও সেখানে ছিলেন।

হ্যাঁ মা, একবার ডেকেছি। তুমি এসে জলটল খেয়েছে তো ?

হ্যাঁ, খেয়েছি।

একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা তোমাকে বল্‌বার আছে মা।

ইন্দু কিছু না বলিয়া উদ্বিগ্নভাবে সুরেশবাবুর পানে চাহিয়া রহিল।

সুরেশবাবু বলিলেন—দেখ মা, যে কথা তোমাকে বল্‌তে যাচ্ছি, তাতে তোমার বাল্যকালের কথা একটু আধটু বল্‌তে হবে; তার জন্য দুঃখিত হোয়োনা। তোমার মনে আছে বোধ হয় আমরা মেহেরপুরে তোমাকে পাই। সেখানে তোমার পরিচয় জানবার জন্য সে সময়ে আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কিছুই তেমন জান্‌তে পারিনি। তোমার বাবার ডায়েরি লেখা অভ্যাস ছিল ; তা থেকে শুধু এইটুকু জেনেছিলাম তোমার ঠাকুরমাকে এক জমীদারের ছেলে তাঁর পিতার অজ্ঞাতসারে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, কিছুদিন পরে তিনি তাঁর পিতাকে একথা বল্‌বেন ; কিন্তু কোন দিনই একথা প্রকাশ কর্‌তে সাহস করেন নি। ফলে তাঁকে আর একটি বিবাহ কর্ত্তে হয়, আর এ বিবাহের কথা অজ্ঞাতই থেকে যায়। তোমার ঠাকুরমার কাছে নিয়ম মত খরচের টাকা আস্‌ত। তিনি মারা যাওয়ার কয়েক মাস পরেই খরচের টাকা আসা হঠাৎ বন্দ হয়ে যায়। তোমায় বাবার তাতে পড়া বন্দ করতে হয় এবং তিনি অনেক কষ্ট পান্। তোমার বাবা লেখাপড়ায় স্বভাব চরিত্রে

খুব ভাল ছিলেন ; ভাল অবস্থায় পড়্‌লে তিনি একজন মহৎ ও বিদ্বান লোক হতে পারতেন। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্য রকম ছিল, তাই তিনি বড় কষ্ট পেয়ে মারা যান।

এ সব কথার মধ্যে ইন্দুর কিছু কিছু মনে ছিল। তাহার পিতার যে অর্থাভাবে জেলে মৃত্যু হয় এবং তাহার মা যে স্বামীর শোকে আত্মহত্যা করেন, এসব কথা তাহার একটু একটু মনে ছিল।

ইন্দুর এই সব কথা শুনিতে অত্যন্ত ভয় হইতেছিল। সে ভীতভাবে বলিল, এ সব কথা এতকাল পরে আমাকে কেন বল্‌ছেন ? আমি কি কোন দোষ করেছি ?

সুরেশবাবু বলিলেন—না মা, তুমি কোন দোষ করনি ; এখন নয়, এর আগেও কখন নয়। এই দুঃখের কথার সঙ্গে একটা আনন্দের কথা আছে সেজন্য তোমাকে বল্‌ছি।

ইন্দু আর কিছু বলিল না। সুধু চাহিয়া রহিল।

সুরেশবাবু বলিতে লাগিলেন—আমি যা জান্‌তে পেরেছিলাম তা থেকে এইটুকু সুধু বুঝেছিলাম যে, তোমার বাপ কোন বড়লোকের ছেলে। কিন্তু সম্প্রতি আমি জান্‌তে পেরেছি—তিনি খুব বড় জমীদারের একমাত্র ছেলে ছিলেন। তোমার পিতামহ পুনরায় বিবাহ কর্‌লেও তাঁর আর কোন সন্তানাদি হয়নি। একই সময়ে তোমার পিতামহের দ্বিতীয়া স্ত্রী ও তোমার প্রপিতামহ মারা যান্। তখন তোমার পিতামহই অগাধ সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী। তখনই তিনি তোমাদের সন্ধান করেন ও মেহেরপুরে লোক পাঠান্। অনুসন্ধানে বিশেষ কিছু খবর পান্ না। যা খবর পেয়েছিলেন তাতে সুধু এইটুকু বুঝেছিলেন যে, তোমার ঠাকুরমা, তোমার বাবা, আর তোমার মা তিনজনেই মারা গেছেন—আর তুমি নিরুদ্দেশ।

লজ্জায় তিনি খুব ভাল ক'রে সন্ধানও করতে পারেন নি ; কারণ তাঁর মত অত বড়লোকের স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূ যেখানে অত কষ্ট পেয়ে মারা গেছেন, সেখানে তাঁর পরিচয় প্রকাশ পেলে বড়ই অমর্য্যাদা হবে এই ভয়ও তাঁর ছিল। যেটুকু সন্ধান নিয়েছিলেন, তাতে যখন কোন সন্ধান মিললনা, তখন তিনি সমস্ত বিষয়ের ভার তাঁর এক বন্ধুর উপর দিয়ে যান্। এক উইল করেন যে তাঁর পৌত্রীর বা তার সন্তানসন্ততির কোন সন্ধান কখন যদি পাওয়া যায়, তাহলে সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশ সে বা তারা পাবে, বাকি অংশ তাঁর নিজের এক বন্ধু পাবেন। যদি পৌত্রীর বা তার সন্তানদের কোন সন্ধান না পাওয়া যায় সমস্ত সম্পত্তিই তাঁর বন্ধুর থাক্‌বে।

এতদিন সে সম্পত্তি সে বন্ধুই ভোগ করছিলেন ; কারণ তাঁর মৃত বন্ধুর পৌত্রীর অর্থাৎ তোমার সম্বন্ধে কোন সংবাদ কয়েকদিন আগে পর্য্যন্ত তিনি পান্‌নি। সম্প্রতি তিনি তোমার সংবাদ পেয়েছেন এবং তোমার প্রাপ্য অর্দ্ধেক সম্পত্তি তোমাকে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন।

কথা শেষ করিয়া সুরেশবাবু ইন্দুর পানে একবার স্থির দৃষ্টিতে চাহিলেন। ইন্দু একটুখানি বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া সুশীলাসুন্দরীর দিকে সরিয়া বসিল। তাহার ভীতভাব দেখিয়া সুশীলাসুন্দরী তাহার পৃষ্ঠে স্নেহভরে হাত রাখিলেন।

সুরেশবাবু আবার বলিলেন—তোমার ঠাকুরদাদার সেই বন্ধুকে তুমি দেখেছ—যদিও তাকে তুমি অন্য সম্পর্কে জেনেছ।

ইন্দু সুশীলাসুন্দরীকে জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুলভাবে সুরেশবাবুর পানে চাহিল। সুরেশবাবু বলিলেন—তিনি আমাদের ছোট বৌমার বাপ গণেশবাবু। তুমি তাঁর কাছে গিয়ে জমীদারির ভার গ্রহণ কর্‌বে ও তোমার বংশের উপযুক্ত মর্য্যাদায় থাক্‌বে, সেজন্য তিনি তোমাকে নিয়ে যেতে চান্ ও তোমার পৈত্রিক বাড়ীতে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে চান্!

ইন্দুর চোখের কোলে কোলে জল ভরিয়া আসিল। ধীরে ধীরে সে জল চক্ষু ছাপাইয়া বিন্দ্ বিন্দু করিয়া ঝরিতে লাগিল। সজলনেত্রে ইন্দু বলিল—"জ্যাঠামশাই, নিতান্ত আশ্রয়হীন হয়েই আমি আপনার কাছে আশ্রয় পেয়েছিলাম। সেই থেকে কন্যার আদরে আমি আপনাদের কাছে আছি। আমার মা বাবা বেঁচে থাক্‌লেও এর চেয়ে আদরে আমাকে তাঁরা রাখতে পারতেন না। এখন আমি সম্পত্তি বা অর্থের জন্য কোন দেশে, কোন জমীদারের অট্টালিকায় যেতে চাইব? আমার এ আশ্রয় থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।"

সুশীলাসুন্দরীর চক্ষুও সজল হইয়া আসিল। তিনি সস্নেহে ইন্দুর চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—এর জন্য কান্না কেন মা? তুমি আমাদের শান্তির চেয়ে তো কম নও মা। বিষয় সম্পত্তি পেয়েছ এ তো আনন্দের কথা। যদি সদ্ব্যয় কর্‌তে চাও অর্থের তুল্য বন্ধু অতি অল্পই আছে। সেখানে তোমার যাবার ইচ্ছা না থাক্‌লে আমরা যেতে দেব কেন! সুরেশবাবুর চক্ষুও ছলছল করিয়া আসিল। তিনি সুশীলাসুন্দরীর কাছে ইন্দুকে রাখিয়া সেখান হইতে উঠিয়া আসিলেন।

খানিকক্ষণ কাঁদিয়া ইন্দু তবে শান্ত হইল।

কোথায় যে তাহার গভীর ব্যথা, কেন যে তাহার চোখে জল তাহার খানিকটা তিনি জানিলেও আপন মনে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

সার্কুলার রোডের উপর একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা; সম্মুখে স্বল্পোচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত অনেকখানি স্থান; তাহাতে নানা জাতীয় ফুল ও চিরসবুজ গাছের সারি, মাঝে মাঝে সুনির্ব্বাচিত স্থানে সুরচিত কুঞ্জ, মাঝখানের রক্তবর্ণ পথ গৃহস্বামীর সৌন্দর্য্য জ্ঞান ও সুব্যবস্থার পরিচয় দিতেছে।

কলিকাতার অধিকাংশ লোকেই জানে, এই অট্টালিকা দেশভক্তত্যাগী মহাত্মা বুদ্ধদেবের পুত্র দেশহিতব্রত বিখ্যাত ব্যারিষ্টার গৌরাঙ্গ দেবের। সেদিন ছুটি। সকাল হইতে বাড়ীটিতে ভিড় সুরু হইয়াছে। শীতের প্রভাত. মাত্র ৭টা বাজিয়াছে। যে কক্ষে ফরাস পাতা থাকে ছুটির দিন বলিয়া গৌরাঙ্গ সেই কক্ষে বসিয়া আছেন। যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে হাস্যমুখে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে আসিতে দেখিয়া গৌরাঙ্গ উঠিয়া নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন—"আসুন, অনেকদিন আসেন নি এদিকে।"

ভদ্রলোক প্রতি নমস্কার করিয়া উপবিষ্ট হইলেন ও বলিলেন—"আজকাল আপনার দয়ায় সময় একটু কম পাচ্ছি—দয়া করে অপরাধ নেবেন না।"

গৌরাঙ্গ হাস্যমুখে বলিলেন—নানা, তাতে হয়েছে কি? আর কিছু কষ্ট বা অসুবিধা নেই তো?

আজ্ঞে না। বেশ চলে যাচ্ছে। আপনি আমার উপর সদয়, সুধু এইটুকু প্রকাশ পাওয়ায় আমার সঙ্গীত বিদ্যালয়ের নাম বেড়ে গেছে। ছাত্রের অভাব হচ্ছেনা। তবু আপনার নিষেধ আছে বলে—আপনার কাছে বৃত্তি পাই, এ কথা কাউকে বলিনি। সবই আপনার দয়া।

সবই ভগবানের দয়া বলুন। তিনিই আপনাকে নেবার মত শক্তি ও গুণ দিয়েছেন তাই পাচ্ছেন। এ মাসের দক্ষিণাটা পেয়েছেন তো ?

আজ্ঞে হাঁ। আপনার আদেশে এখানে এসে তো কখন অপেক্ষা করতে হয় না। আসবা মাত্র বিদায়। আপনার অসীম দয়া।

দয়া—এ কথা আপনি আর বল্‌বেন না। আমি তো আপনাকে সাহায্য করি না। সঙ্গীত একটা এত বড় বিদ্যা আমাদের দেশে নষ্ট হতে বসেছে—সেই সঙ্গীত যাতে রক্ষা পায়—আপনাদের নিজের সম্পত্তি যাতে বাঁচাতে পারি, সেজন্য যৎসামান্য চেষ্টা করি। আপনিও সঙ্গীতের উদ্ধার ও উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, আমিও তাই করি।

আচ্ছা, আমি আর ওসব কথা বল্‌তে চাইনে, স্বধু এই বলি শ্রীভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন। এখন উঠি; আপনার বেশী সময় আমি একা নষ্ট কর্‌লে অপরের প্রতি অবিচার হবে।

সঙ্গীত শিক্ষক চলিয়া গেলে একটি প্রিয়দর্শন দীর্ঘাকৃতি যুবক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার বেশ—ধুতি ও উড়ানি—সুপরিস্কৃত কিন্তু সাবান দিয়া কাচা তাহা লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়। কিন্তু উড়ানিখানি গায়ে এমনভাবে জড়ানো যাহাতে তাহার দীর্ঘ গৌরবর্ণ দেহকে একটা বিশিষ্টতা দিয়াছে।

গৌরাঙ্গ তাহাকে হাস্যমুখে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। বলিলেন—"আপনার বইখানি বড় সুন্দর হয়েছে। কালই আমি সেখানি ছাপাবার ব্যবস্থা করে এসেছি। আপনার রচনা ভঙ্গী বড় মনোরম। বলেন্দ্র ঠাকুরের কবিত্বপূর্ণ গদ্যের পর এমন লেখা আর দেখা যায়নি।

যুবক একটু সংকচোর সহিত বলিল—আমার প্রার্থনা ছিল বইখানি সত্ত্ব বিক্রয় করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা আমার আর্থিক অবস্থাও খাবার—

গৌরাঙ্গ বলিলেন—আপনার বইখানির সত্ত্ব বিক্রি কর্‌লে ভবিষ্যতে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হ'ত। সেজন্য সে ব্যবস্থা কর্‌লাম না। বই ছাপাবার ব্যবস্থা আমি করে দিইছি। হিসাব ওঁরা আপনার নামেই রাখ্‌বেন। বৎসরে দু'বার হিসাব করে আপনার প্রাপ্য টাকা ওঁরা ঠিক নিয়মিতভাবে পাঠিয়ে দেবেন। আর আপাততঃ আপনি যাবার সময় একবার মৃণালের সঙ্গে দেখা করে যাবেন আর এই চিঠিখানা দেবেন।

মৃণাল গৌরাঙ্গের একজন কর্ম্মচারী। তাহার কাজ হইতেছে প্রভুর নির্দ্দেশমত সকলকে নিৰ্দ্দিষ্ট দিনে অর্থ সাহায্য করা।

যুবক উঠিয়া পাশের ঘরে গেল। মৃণাল চিঠিখানি পড়িয়া প্রভুর নির্দ্দেশমত অর্থ তাহার হাতে দিল।

যুবকের মুখে চোখে বিস্ময় ও প্রফুল্লতা ফুটিয়া উঠিল। কোঁচার খুঁটে নোট কয়খানি বাঁধিয়া সে এই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল—জগতে এমন লোকও আছে।

কিছুক্ষণ পরেই একটি অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক প্রণাম করিয়া গৌরাঙ্গের পায়ের কাছে বসিল।

গৌরাঙ্গ প্রসন্নমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—কিহে, সব খবর ভালতো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমার বাবা বেশ সেরেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে।

আমার আশীর্ব্বাদে বুঝি রোগ সারে? তোমাকেও 'আশীর্ব্বাদ' রোগে ধরেছে?

আপনার আশীর্ব্বাদের শক্তি আছে—এ আমি খুব বিশ্বাস করি।

আচ্ছা, বেশ কর; তুমি খুব জ্ঞানী।

হ্যাঁ ভাল কথা,—গেল মাসে শুন্‌লাম তুমি টাকা নিয়ে যাওনি।

আপনার দয়ায় আমার সে অসুবিধা কেটে গেছে। স্কলারশিপের টাকাতে আমার খরচা চলে যায়। একটা টিউশনি পেয়েছি—সে টাকাটা বাড়ী পাঠাই ; আর বাবাও কাজ করতে সুরু করেছেন। ও টাকায় আবার আর একজনকে সাহায্য কর্‌তে পার্‌বেন।

আচ্ছা তাই হবে। বি-এ, পড়ার সময়টা পর্য্যন্ত পাও তো। এবারটা টিউশানি কোরোনা। যদি কিছু বাঁচে জমাও।

যে আজ্ঞে তাই কর্‌ব।

আচ্ছা বেশ, টাকা নিয়ে যাও। মাঝে মাঝে খবর নিতে এস।

আজ্ঞে আস্‌ব। . ছেলে পাড়য়ে তেমন সময় পেতাম না ; তাই ইদানীং আস্‌তে পারতাম না। আজ তাহলে উঠি।

হ্যাঁ, এস। হয়েছে—হয়েছে—আর ভূমিষ্ঠ হতে হবে না।

ছেলেটি তবু ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া তবে ছাড়িল।

এইরূপে আরও জনকয়েক আসিয়া সাহায্য লইয়া চলিয়া গেল।

ঘড়িতে ১১টা বাজিল।

গৌরাঙ্গ একটি বালক ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন—একবার ভিতর থেকে জেনে এস, তোমাদের মায়ের কাজ শেষ হয়েছে কিনা।

একটু পরে সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—মার কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। এক বুড়িমা কেবল তাঁর কাছে বসে আছেন। তিনিও পেয়েছেন—উঠ্‌বেন। মা বলে দিলেন আপনি ভেতরে যান্‌।

গৌরাঙ্গ আর একটু অপেক্ষা করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

দুস্থ মেয়েরা যাহাদের পুরুষ অভিভাবক নাই, তাহারা শান্তির কাছে আসিত। শান্তি ততক্ষণে কাজ শেষ করিয়া স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিত।

গৌরাঙ্গ বলিলেন—আজ আবার গোলদীঘিতে সভা আছে। ঠিক তিনটায় বা'র হতে হবে।

শান্তি বলিল—তা মনে আছে। আচ্ছা দাদা যাবেন না ?

না যেতে পারে—মণী আজকাল অন্য আদর্শে চল্‌ছে যে। অসহযোগের সভাতেই সে যায়, আর গান গায়। তার এক একটা গানে আজকাল ৫০টা বক্তৃতার কাজ হচ্ছে।

এবার দাদা যেখানে গান গাইবেন আমাকে একবার নিয়ে যেও তো।

বেশ—তাই যাব।

তারপর আহারাদি শেষ করিয়া দুইজনে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বাহির হইলেন। যাইবার সময় পিতামাতার তৈলচিত্রের দিকে চাহিয়া প্রণাম করিতে কেহই ভুলিলেন না।

৩৯

এক বৎসরের মধ্যে অসহযোগ প্রবল হইয়া উঠিল। বাংলাদেশে যেমন সকল বিষয়ের প্রারম্ভে মহাসমারোহ হয়, এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না।

মণীন্দ্র অসহযোগে মাতিয়া উঠিল বি-এল অর্দ্ধপথে ছাড়িয়া দিল ও বিনা বেতনে জাতীয় কলেজের প্রফেসারের কাজ লইল। গৃহে পতিপ্রাণা স্ত্রী, ১টি পুত্র আসিয়া গৃহ আলো করিয়াছে, পরম স্নেহময় ভ্রাতা, দেবতার মত পিতামাতা ;—তবু সে সব ছাড়িয়া দেশের কাজে মগ্ন হইয়া আছে। যুবকসঙ্ঘের সে সম্পাদক, সেবা-সমিতির সে সভাপতি ও শ্রেষ্ঠ সেবক ; বালক ও যুবকদের শরীর ও মন যাহাতে উচ্চ হয় তাহাই মণীন্দ্রের দিবা-রাত্রি চিন্তা। ইহার উপর সভাসমিতি তো লাগিয়াই আছে যেখানে মণীন্দ্রের একটি গান নহিলে চলিবেই না।

সুরেশবাবুর নিকট উপর হইতে গোপনীয় পত্র আসিল, তিনি যেন পুত্রকে সামলাইয়া লন্ নচেৎ—

সুরেশবাবু উত্তরে জানাইলেন—পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক, তাঁহার অধীন নহে। পুত্রের স্বাধীন ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার তাঁহার আর নাই।

ব্যাপার তখন আর ইহার বেশী অগ্রসর হইতে পারিল না।

বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স য়্যাক্ট হঠাৎ একদিন অধিকাংশ লোকের অমতেও বাহির হইয়া গেল। প্রবীণ ও বৃদ্ধের বক্ষে ব্যথা ও দুশ্চিন্তার ভার পুঞ্জীভূত হইয়া পড়িল। তরুণের চক্ষে অগ্নি জ্বলিল।

সেদিন অপরাহ্ণের মহতী সভা কলিকাতাবাসীর মনে চিরজাগরুক হইয়া রহিবে। নগরের সমস্ত তরুণের দল সেদিন মণীন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া ছিল। ধীরে ধীরে বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ অনেকে আসিয়া যোগ দিল। কত খ্যাতনামা বক্তা বক্তৃতা দিলেন, সকলের হৃদয়ে সাহস দিবার চেষ্টা করিলেন।

জাহ্নবীর পশ্চিমপ্রান্তে রক্তসূর্য্য ঢলিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মণীন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সকলেরই মনে হইল, সে যেন কোথায় সত্য দর্শন করিয়াছে—তাই সত্যের বার্ত্তা ও বাণী তাহার চক্ষে ও কণ্ঠে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মণীন্দ্র গাহিল—

নিশিদিন ভরসা রাখিস্
ওরে মন হবেই হবে।
যদি পণ করে থাকিস্
সে পণ তোমার রবেই রবে।
ওরে মন হবেই হবে॥

পাষাণ সমান আছে পড়ে'
প্রাণ পেয়ে সে উঠ্‌বে ওরে,
আছে যারা বোবার মতন,
তারাও কথা কবেই কবে।
ওরে মন হবেই হবে।

সময় হোলো, সময় হোলো,
যে যার আপন বোঝা তোলো,
দুঃখ যদি মাথায় ধরিস্‌
সে দুঃখ তোর সবেই সবে।
ওরে মন হবেই হবে।

ঘণ্টা যখন উঠ্‌বে বেজে
দেখ্‌বি সবাই আস্‌বে সেজে,
একসাথে সব যাত্রী যত
একই রাস্তা লবেই লবে।
ওরে মন হবেই হবে॥

গানের প্রতি অক্ষর ও প্রতি সুরকণা হইতে যেন সুধা ঝরিতে লাগিল ; সেই বিশাল জনতা মন্ত্রমুগ্ধবৎ সুধাপান করিতে করিতে গায়কের পানে চাহিয়া রহিল। শত শত বক্তৃতায় যাহা না হইত, একটি গানে তাহার অপেক্ষা লক্ষগুণে কাজ করিয়া গেল। গানের সুর যেন সবারই কানে কানে মধুর সুরে বলিয়া গেল—হতাশ হইও না, পণ স্থির রাখিও, পূর্ণ হইবে। নিজের কাজটুকু সুধু করিয়া যাও—সবারি কাজ আপনি গড়িয়া উঠিবে। কাহাকেও অলস দেখিলে হতাশ হইও না ; সময় যখন আসিবে,

দেখিও সবাই আপন আপন পথ লইয়াছে। তুমি স্থধু আপনার পথ স্থির রাখিও; মনের বল ও হৃদয়ের ভরসা হারাইও না।

বক্তাদের একপার্শ্বে মহিলাদের আসন ছিল। অনেক মহিলাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইন্দু, কমলা ও উষা ফণীন্দ্রের সঙ্গে আসিয়াছিল। শান্তি আসিয়াছিল গৌরাঙ্গের সঙ্গে। সুরেশবাবু ও সুশীলাসুন্দরী ইচ্ছা করিয়াই আসেন নাই। গানের সুরে সবারই চোখে জল আসিয়াছিল।

গান থামিয়া গেলে এক এক করিয়া যুবক, প্রৌঢ় ও মহিলারা উঠিয়া অসহযোগের জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিল। মহিলাদের মধ্য হইতে ইন্দু সর্ব্বাগ্রে উঠিয়া প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিল। তারপর আরও কয়েকটি মহিলা উঠিলেন। জনতা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

৩০

সেদিন ছুটি। মণীন্দ্রের অত্যধিক কাজ, তরুণ সমিতির উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য বহু পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছে; কেহ কুস্তির জন্য, কেহ লাঠি খেলার জন্য, কেহ তীর ছোড়ার জন্য, কেহ দৌড়িয়া, কেহবা সাঁতার কাটিয়া পুরস্কার পাইতে লাগিল। এখানেই বেলা ১০টা বাজিয়া গেল। সেখান হইতে উঠিয়া মণীন্দ্র সেবাশ্রমে গেল। সেবাশ্রমে দেখা শোনা করিতে বেলা ১২টা বাজিয়া গেল। তখন মণীন্দ্র বাড়ীর উদ্দেশে বাহির হইল।

বাড়ীতে সকলে মণীন্দ্রের অপেক্ষায় তখনও বসিয়া। সুশীলাসুন্দরী এক একবার বাহিরের দিকে চাহিতেছিলেন। একবার বলিলেন—আজ যেন মণীর একটু বেশী দেরী হচ্ছে না?

ফণী বলিল—না মা, তুমি অনেকক্ষণ এই কথাই ভাবছিলে, তাই এমন মনে হচ্ছে। এই বারোটা বাজ্‌ল মণী এল বলে।'

সুশীলাসুন্দরীর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। সুরেশবাবু স্ত্রীর পানে ফিরিয়া বলিলেন—আজ যেন তোমাকে বড় কাতর দেখ্‌ছি।

সুশীলাসুন্দরীর চোখের কোলে কোলে তখন জল ছাপাইয়া আসিয়াছে। কোনমতে অশ্রু গোপন করিয়া তিনি বলিলেন, আজ মণীর জন্য আমার মন বড় কাঁদ্‌ছে। কেবল মন কু গাইছে। ইচ্ছা কর্‌ছে কিছুকাল তাকে কোথাও যেতে না দিয়ে আমার কোলের কাছে বসিয়ে রাখি।

ফণীন্দ্র বলিল, তাই তাকে বোলো মা—তোমার কথা কিছুতে সে অমান্য কর্‌বে না।

সুশীলাসুন্দরী। তা তো জানি, বাবা। কিন্তু কি করে তাকে বারণ করি; সে তো কোন অন্যায় কর্‌ছে না। আমার নিষেধে সে ঘরে বসে থাক্‌বে, আর মন তার দেশের কাজের জন্য ছট্‌ফট্‌ কর্‌বে—তাতেও তো আমি সোয়াস্তি পাব না।

সুরেশবাবু। তুমি তো সত্য চিরদিনই সহ্য কর্‌তে জান। মণী যে কাজ নিয়েছে তাতে তো পদে পদে বিপদ। সব জেনে শুনে এত বিচলিত হওয়া তোমার ঠিক হয় না।

সুশীলা। কি কর্‌ব বল—এক একবার মন বড়ই কাতর হয়ে পড়ে। একি ছোট বৌমা—তুমি কাঁদছ কেন মা? তোমার মত ভাগ্য কার হয়?

কমলা কিছু বলিতে পারিল না। কাঁদিয়া শাশুড়ীর কোলে মুখ লুকাইল।

এমন সময় মণীন্দ্র আসিয়া পৌঁছিল। সকলের মুখে চিন্তার ভাব

দেখিয়া মণীন্দ্র লজ্জিত হইয়া কহিল, আমার আজ একটু দেরী হয়ে গেছে মা।

সুশীলাসুন্দরী মুখে প্রফুল্লতা আনিয়া কহিলেন, আজ আবার কিছু না খেয়ে কোন্ সকালে বেরিয়েছিলি বল দেখি। একটু জিরিয়ে শীগ্‌গির নেয়ে নে। আমি ভাত দেবার ব্যবস্থা করিগে। সুশীলাসুন্দরী উঠিলেন। ঊষা, কমলা ও ইন্দু সঙ্গে সঙ্গে গেল।

মণীন্দ্র শীঘ্র শীঘ্র স্নান সারিয়া আসিল। পিতার সঙ্গে দুই ভাই খাইতে বসিল।

সুশীলাসুন্দরী নিজে আজ পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। ঊষা ও কমলা অনুযোগ করিতে সুশীলাসুন্দরী বলিলেন—"তোমরা তো রোজই কর মা। আজকে আমিই করি।"

আহারান্তে সুরেশবাবু আপনার কক্ষে বিশ্রাম করিতে গেলেন। দুই ভাই বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল।

বাহিরে একবার মোটারের হর্ণ বাজিল। একটি ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, একজন পুলিশের বাবু এসেছেন। ফণীন্দ্র, মণীন্দ্রের মুখের পানে চাহিল। মণীন্দ্র ভৃত্যের পানে চাহিয়া বলিল—"তাঁকে এখানে নিয়ে এস।"

উচ্চপদস্থ পুলিশের পরিচ্ছদে সজ্জিত একজন বাঙালী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, মণীন্দ্র তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া একখানি আসনে বসাইল।

ফণীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—আপনার কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

পুলিশ কর্ম্মচারী বলিলেন—আমার দোষ গ্রহণ করবেন না—মণীন্দ্র বাবুর নামে একখানি ওয়ারেণ্ট আছে। বলিয়া পকেট হইতে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া মণীন্দ্রকে দেখাইল।

মণীন্দ্র কাগজখানি একবার পড়িয়া কর্ম্মচারীর হাতে ফেরৎ দিয়া নির্বিকার ভাবে বলিল—"এক্ষণি যেতে হবে?"

কর্ম্মচারী বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, সব প্রস্তুত।

মণীন্দ্র বলিল—আমার মা এই মাত্র খেতে বসেছেন। তিনি খেয়ে উঠতে আধঘণ্টাটাক্ দেরী হতে পারে। সেই টুকু অপেক্ষা করতে পারবেন না?

কর্ম্মচারী একটু বিচলিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারব। আমি একঘণ্টা বাহিরে গিয়ে অপেক্ষা করছি; আপনি প্রস্তুত হয়ে নিন্।

কর্ম্মচারী উঠিতে উদ্যত হইলেন। মণীন্দ্র বলিল, আপান এখানেই বসুন্—তাতে কোন বাধা আছে?

কর্ম্মচারী বলিলেন—বাধা কিছু বিশেষ নেই; তবে আমাদের কর্ত্তব্য অপ্রীতিকর—আমাদের মত জীবের বাইরে থাকাই ভাল।

মণীন্দ্র বলিল—না, না,—আপনার কি দোষ। আপনি যে আমাকে একঘণ্টা সময় দিয়েছেন—এতে আপনার দয়ার পরিচয় পেয়েছি।

ফণীন্দ্র বলিল—একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি?

কর্ম্মচারী উত্তর দিল—করুন্।

মণীন্দ্রকে কেন ধরা হয়েছে, এ সম্বন্ধে আপনি কিছু বল্‌তে পারেন?

আপনি বিজ্ঞ, সব তো জানেন। বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স এক্ট্ অনুসারে এঁকে ধরা হচ্ছে।

বিচার হবেনা?

আপাততঃ কোনখানে আবদ্ধ রাখা হবে।

কোথায়?

আপাততঃ আসাম।

বাহিরে না—জেলে?

জেলে ?

তিন জনে নির্ব্বাক্ হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন।

মণীন্দ্র বলিল, দাদা তুমি যেন মুষ্‌ড়ে যেওনা; সবাইকে দেখবার ভার এখন তোমার। একবার তরুণ-সমিতিতে গিয়ে শুধু বলে এস—আমি চল্লাম, তারা যেন নিজেদের কর্ত্তব্য করে যায়। আর কোথায় গিয়ে পড়্‌তে হবে তার তো ঠিক নেই খান কয়েক ভাল বই তুমি আমার জন্য বেছে রাখ। আমি ততক্ষণ বাড়ীর ভেতর থেকে আসি একবার।

মণীন্দ্র উঠিয়া ভিতরে গেল। ফণীন্দ্র বই গুছাইতে লাগিল।

সুরেশ বাবুর কাছে সুশীলাসুন্দরী মণীন্দ্রের খোকাকে কোলে করিয়া সবে আসিয়া বসিয়াছেন। উমা ও কমলা মেঝের উপর বসিয়া আছে। ইন্দু বিবেকানন্দ স্বামীর একখানি বহি পড়িতেছে—সবাই শুনিতেছে। ফণীন্দ্রের বালক পুত্র খাতা পেন্‌সিল লইয়া অঙ্ক কসিতেছিল; সেও মাঝে মাঝে অঙ্ক কসা বন্ধ রাখিয়া ইন্দুর পড়া সবিস্ময়ে শুনিতেছে।

এমন সময়ে মণীন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সুশীলাসুন্দরী ভীত ভাবে পুত্রের পানে চাহিলেন। প্রভাত হইতে তাঁহার হৃদয় পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় ব্যাকুল ছিল।

মণীন্দ্র ধীরে ধীরে মায়ের পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার পায়ের উপর ক্ষণকালের জন্য আপনার মাথা রাখিল। পরে মাথা উঠাইয়া চাহিতে সুশীলাসুন্দরী স্নেহভরে পুত্রের মাথায় হাত রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বাবা ?"

মণীন্দ্র বলিল, মা তুমি দুঃখ পেওনা—এবার তোমাদের কিছুদিন ছেড়ে যেতে হবে।

কেন বাবা, কি হয়েছে বাবা ?

বলিয়া সুশীলা সুন্দরী ব্যাকুলভাবে পুত্রকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন।

মণীন্দ্রের চোখে এবার জল আসিল। চক্ষু মুছিয়া—মণীন্দ্র বলিল—মা, তোমার বলেই আমার বল। তুমি চোখের জল ফেল্‌লে আমি যে একেবারে দুর্ব্বল হয়ে যাব। নূতন আইনে আমাকে বন্দী করে রাখা হবে, তাই পুলিশের এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার লোক জন সঙ্গে এসেছেন। এ সময়ে তুমি ভেঙ্গে পোড়োনা মা।

পরে পিতার পানে চাহিয়া বলিল—বাবা, আপনি মাকে বলুন একবার।

সুরেশ বাবু সুশীলাসুন্দরীর পানে চাহিয়া বলিলেন তোমার ছেলে তো কোন হীন কাজ করে জেলে যাচ্ছেনা, যে তার জন্য তুমি চোখের জল ফেল্‌বে। তোমার ছেলে তো শুধু তোমার আমার গৌরব নয়—সমস্ত ভারতবর্ষের গৌরব। বুকে বল বাঁধ, ছেলেকে—আশীর্ব্বাদ কর।

বলিয়া সুরেশ বাবু ক্ষণেকের জন্য পুত্রের মাথায় হাত রাখিলেন। মনে মনে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সুশীলাসুন্দরী চক্ষু মুছিয়া পুত্রের মাথায় পরম স্নেহভরে হাত রাখিয়া বলিলেন—চিরজীবি হও। আবার হাসিমুখে শীঘ্র ফিরে এস। আবার দেশের কাজ কর।

মণীন্দ্র তখন উঠিয়া পিতার চরণে মাথা নত করিল। সুরেশ বাবু আবার নীরবে পুত্রের মাথায় হাত রাখিলেন।

ফণীন্দ্র ধীরে ধীরে বলিল—বাবা তাহলে এখন যাই।

সুরেশ বাবু চাহিয়া দেখিলেন ইন্দু, ঊষা, কমলার সবারই চোখে জল। বলিলেন—মা তোমারা একটু আপন আপন ঘরে যাও মা—। মণি কোন খানে যাবার আগে তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা করে তবে যাবেন।

তাহারা উঠিয়া ; চোক্ষু মুদিয়া তখন কেহই কুল পাইতেছিল না।

সুরেশ বাবু তখন পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কোথায় নিয়ে যাবে বা কতদিন রাখ্‌বে সে সব কিছু জান্‌তে পারনি বোধ হয় ?

মণীন্দ্র বলিল—ইনি অতি সজ্জন। বল্‌লেন নূতন অর্ডিন্যান্স এক্ট্‌ অনুসারে ধরা হচ্ছে—সম্ভবতঃ বিচার হবে না এবং জেলেই রাখ্‌বে—তবে সময়ের আভাস কিছু দিতে পারেন না।

সুরেন বাবু তখন বলিলেন—সকলের ঘরে গিয়ে একবার দেখা করে তুমি এস। আমি নীচে তোমার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছি।

মণীন্দ্র মাতা পিতাকে সে কক্ষে রাখিয়া বাহিরে আসিল। উষার কক্ষে আসিয়া দেখিল, উষা দুয়ারের কাছে দাড়াইয়া চক্ষু মুছিতেছে।

মণীন্দ্র উষাকে প্রণাম করিয়া কহিল—বৌদিদি, এবার মায়ের ভার তোমার। ফিরে এসে যেন মাকে দেখ্‌তে পাই।

উষা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, তোমার অভাব মায়ের কি করে দূর কর্‌ব ঠাকুরপো। তবে আমার যা সাধ্য তা কোরবো।

মণীন্দ্র ধীরে ধীরে আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। কমলা কক্ষমধ্যে চাহিয়া নীচে নামিয়া পথের দিকে চাহিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিল। স্বামীকে দেখিয়া একটু পাশের দিকে সরিয়া আসিল।

মণীন্দ্র কমলার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া, তাহার রোদনারক্ত মুখের পানে চাহিয়া বলিল—চুপ কর, কমলা! কাতর হোয়োনা। বাপের মায়ের ভার—খোকার ভার এখন তোমায় নিতে হবে। আমি আবার ফিরে আস্‌ব।

কমলা আর আপনাকে সংবরণ করিতে পারিলনা। স্বামীর বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল, তোমার কাছে থেকে যে এখনও আমার একটুও আশ মেটেনি। কেমন করে আমি তোমায় ছেড়ে থাক্‌ব। আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে।

মণীন্দ্র তাহার অশ্রু মুছাইয়া বলিল—তুমি স্থির হও কমলা। তোমাকে এভাবে দেখে গেলে যতদিন আমি জেলে থাকব, ততদিন সর্ব্বক্ষণ আমার মনে হবে তুমি কাঁদচ।

কমলা অশ্রু মুছিয়া মুখে শান্ত ভাব আনিতে চেষ্টা করিল; পরে স্বামীকে গমনোদ্যত দেখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। স্বামী চক্ষুর অন্তরালে যাইতেই কমলা সেই কক্ষতলে লুটাইয়া পড়িল।

সব শেষে ইন্দুর কক্ষ। ইন্দু দুয়ার হইতে সামান্য দূরে সিঁড়ির কাছাকাছি জায়গাটায় দাঁড়াইয়া ছিল। মণীন্দ্র ইন্দুকে দেখিয়া বলিল—"ইন্দু, আমি চল্লাম; কমলাকে তুমি দেখ—যতদিন এখানে থাক।"

ইন্দু শান্তভাবে বলিল, আমি অনেকদিন এখানে থাকব কখনও; তোমরা তাড়াতে পারবে না। কমলাকে আমি দিন রাত্রি দেখ্‌ব—তাকে অন্যমনস্ক রাখ্‌ব। তুমি আমাকে যা আদেশ করে যাবে, তা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন কর্‌ব। তুমি সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থেক।

'তুমি চিরসুখিনী হও' বলিয়া ইন্দুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মণীন্দ্র অগ্রসর হইতে ইন্দু বলিল—একটু দাঁড়াও, কোন দিন তোমায় প্রণাম করিনি—আজ একটা প্রণাম করে নিই।

বলিয়া গলে অঞ্চল দিয়া ইন্দু মণীন্দ্রের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। পরক্ষণে—মণীন্দ্রের মনে হইল দুখানি কোমল ওষ্ঠ যেন তাহার পায়ের উপর বুলাইয়া গেল। পরক্ষণে ইন্দু উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া দ্রুতবেগে আপন কক্ষে প্রবেশ করিল ও তৎক্ষণাৎ দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল।

মণীন্দ্র নীচে নামিয়া দেখিল পুলিশ কর্ম্মচারীর সহিত তাহার পিতা কথা কহিতেছেন। মণীন্দ্র নিকটে আসিয়া বলিল, একটু বেশী দেরী হয়ে গেল; ক্ষমা কর্‌বেন। এবার আমি প্রস্তুত।

পুলিশ কর্ম্মচারী অগ্রসর হইলে মণীন্দ্র শান্তমুখে তাঁহার অনুসরণ করিল।

ফণীন্দ্র ও সুরেশ বাবু সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিলেন।

মণীন্দ্র আর একবার পিতার পায়ের ধুলা লইল; দাদাকে প্রণাম করিয়া হাসিমুখে—তাহার পানে চাহিল। পরক্ষণে গাড়ীতে গিয়া উঠিল। পুলিশ কর্ম্মচারী মণীন্দ্রের পাশে উঠিয়া বসিলেন। মোটর শব্দ করিয়া ছাড়িয়া দিল ও মুহূর্ত্তে দৃষ্টি পথের অতীত হইয়া গেল! যেন একটা আর্ত্তনাদের সঙ্গে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বহিয়া গেল।

৪১

পরদিন প্রভাতে সকলে শুষ্কমুখে একত্র বসিয়া। গৌরাঙ্গ ও ঊষা খবর পাইয়া রাত্রেই আসিয়াছিল। সারারাত্রি একটা দুঃস্বপ্নের মত কাটিয়া গিয়াছে। কাহারও চক্ষে নিদ্রা আসে নাই। সকলেই যথাসাধ্য আপনার দুঃখভার গোপন রাখিতে চেষ্টা করিতেছে; কারণ একের দুঃখ প্রকাশ অপরকে আঘাত করিবে। কেবল সুশীলাসুন্দরী ও কমলার মুখে একরাত্রেই এমন একটা গভীর ছাপ বসিয়া গিয়াছে, যে এই দু'জনের মুখের পানে কেহই চাহিতে পারিতেছিলনা।

সুরেশ বাবুই প্রথমে কথা কহিলেন। বলিলেন, দেখ কাল রাত্রে আমরা যতখানি মুষ্‌ড়ে গিছ্‌লাম, অতখানি মুষড়ে যাওয়া আমাদের কারও উচিত হয়নি। মণীর ইণ্টার্ন্‌ড্‌ হওয়া বা জেলে যাওয়া আমাদের কাছে একটা গৌরবের জিনিস। এ পর্য্যন্ত কোন্ কাজ না সে সগৌরবের করেছে বল? তাকে ডেপুটির পদ যোগাড় করে দিতে চাইলাম, সে তা নিলে না। আর আমি যখন এই ডেপুটিগিরি পেয়েছিলাম,—আমার

বোধ হয় তিন রাত্রি ঘুম হয়নি। দেশের জন্য কি উপযুক্ত ভাবে সে খাট্‌তে শিখেছিল, আর কি অক্লান্ত ভাবে খাট্‌ত। সে শুধু এই চেষ্টা নিয়ে থাকৃত কিসে দেশের সবাই দেহে মনে আত্মায় বড় হয়; আর সে জন্য তার চেষ্টার অন্ত ছিল না। তার এই চেষ্টার মধ্যে ষড়যন্ত্র, এ সব কিছুই ছিল না। তাকে যারা বন্দী কর্‌বে, তাকে যারা নির্য্যাতন কর্‌বে, তারা নিজের পরাজয় নিজেই ঘোষণা কর্‌বে।

কেহ কোন উত্তর করিল না। কমলা ও সুশীলাসুন্দরী মুখ ফিরাইয়া অশ্রু গোপন করিলেন।

কেবল ইন্দুর চোখে যেন আগুন জ্বলিতে লাগিল। সে যেন কি বলি বলি করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর সে বলিল—"জ্যাঠামশায় এর কি কোন প্রতিকার নেই ?"

সুরেশ বাবু। কিসের প্রতিকার তুমি চাইছ মা ?

ইন্দু। এই যে বিনাপরাধে ধরে নিয়ে গিয়ে অবিচারে জেলে রেখে দেবে—এর বিরুদ্ধে কি কিছুই বল্‌বার বা করবার নেই ?

সুরেশ বাবু। যদি বিচার হ'ত, তাহলে তো ঢের বল্‌বার ও করবার ছিল। তাহলে কার সাধ্য যে মণীকে জেলে রাখে ? কিন্তু এর তো বিচার হবে না মা। যে আইনে এঁদের ধরা হচ্ছে, তাতে যে দেশে যেখানে ইচ্ছা এঁদের রেখে দেওয়া হবে। তার বিরুদ্ধে কিছু বল্‌লে গ্রাহ্য হবে না।

ইন্দু। কত দিন রাখ্‌বে।

সুরেনবাবু। যারা রাখ্‌বে তাদের ইচ্ছা।

ইন্দু। তাহলে কি একেবারে চুপ বসে থাকৃতে হবে আমাদের।

সুরেশবাবু। না মা। তোমরা ক্ষুব্ধ হোয়োনা, আজ থেকেই আমরা চেষ্টা করছি, যাতে সে মুক্তি পায়। গৌরাঙ্গ ও ফণী কাল রাত থেকে সেই চেষ্টাতেই ঘুরচে।

ইন্দু। আমি আজ থেকে আর কলেজে যাব না।

সুরেশবাবু। কেন মা? তোমার পড়াতে এত আগ্রহ! আর ক'মাস পরেই পরীক্ষা; এটা শেষ করলে হ'ত না মা?

ইন্দু। আমি কমলাকে দেখব, জ্যাঠামশায়।

আমি না থাকলে কমলার বড় একা বোধ হবে। পড়ার চেয়ে আমি এতে বেশী সুখে থাকব। আপনি দয়া করে অনুমতি দিন্।

ইন্দুর মুখ বলিতেছিল, আমি কমলাকে দেখিব, হৃদয় বলিতেছিল, আর আরও কিছু।

ইন্দু। অনুমতি পাইল।

সুরেশ বাবু পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, ফণী এবার তোমাদের একটু ব্যয় সংকোচ করতে হবে, আমার আর চাকরী করবার ক্ষমতা নাই; অথচ পেনসনের টাকা থাওয়াও আমার কঠিন হবে। আমি সে জন্য আজ পদত্যাগ পত্র লিখে পাঠাচ্ছি।

বলিয়া পকেট হইতে বাহির করিয়া এক খানি লেখা চিঠি ফণীর হাতে দিলেন। ফণী পত্র খানি লইয়া সকলকে শুনাইয়া পড়িল। তাহাতে লেখা ছিল যে, তিনি একাদিক্রমে ত্রিশ বৎসর কাল আপনার জ্ঞান বুদ্ধি ও ক্ষমতা মত গভর্ণমেণ্টের সেবা করিয়া আসিয়াছেন। অধুনা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রাজদ্রোহ অভিযোগে ধৃত হওয়ায়, তিনি হৃদয়ে এমন আঘাত পাইয়াছেন যে, ইহার পর পূর্ব্বের মত আন্তরিকতার সহিত কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হইবে না, তাঁহার পুত্র মণীন্দ্র নির্ম্মল ও নিষ্পাপ, ইহা তিনি নিঃসন্দেহে অবগত আছেন। দেশের তরুণ ও যুবকগণের দেহ, মন ও আত্মাকে সবল উন্নত, ও পবিত্র করিবার তাঁহার পুত্রের যে প্রচেষ্টা ছিল, তাহাকে তিনি পরম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। ত্রিশ বৎসর ব্যাপি রাজ সেবার ফলে তিনি

তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এই যে অন্যায় ও কঠিন ব্যবহার পাইয়াছেন, তাহারই নম্র প্রতিবাদ স্বরূপ আজ হইতে তিনি পদত্যাগ করিলেন। তাঁহার বিনীত প্রার্থনা যে, তাঁহার এই পদত্যাগ পত্র যেন আজিকার তারিখ হইতে গৃহীত হয়। যদি তাহাতে বিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে ইহা গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত যেন তাঁহাকে বিনা বেতনে অবকাশ দেওয়া হয়।

পদত্যাগ পত্র শুনিয়া সকলের চক্ষুই সজল হইয়া উঠিল। এইবার ইন্দুর চোখেও জল আসিল।

ইন্দু সেদিন আহারাদির পর সুশীলাসুন্দরীর অনুমতি পাইয়া গাড়ী লইয়া একবার বাহিরে গেল। অপরাহ্ণে ফিরিয়া আসিয়া ইন্দু একতাড়া নোট সুরেশবাবুর পায়ের কাছে রাখিয়া সাশ্রুনেত্রে বলিল—"জ্যাঠামশায় আমার টাকা আছে, আপনিই আমাকে বলেছিলেন। আজ আমি দাদামশায়ের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে এসেছি। ছোটদার উদ্ধারের জন্য আপনি দয়া করে এই টাকা গ্রহণ করুন।"

সবারই চোখে জল আসিল।

সুরেশবাবুও বিচলিত হইলেন। তিনি আপনাকে সম্বরণ করিয়া শান্তকণ্ঠে বলিলেন—মা, আমি তোমার টাকা নিলাম। ফণী, ইন্দুর নামে ব্যাঙ্কে যে হিসাব আছে, তাতে এ টাকা আপাততঃ জমা রেখে দাও। তুমি ক্ষুব্ধ হোয়োনা মা—দরকার হলেই আমি তোমার এ টাকা কাজে লাগাব।

সুশীলাসুন্দরী এ শোক সাম্‌লাইতে পারিলেন না। কয়েকমাসের মধ্যেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন।

সুরেশবাবু, ফণীন্দ্র, মণীন্দ্রের শ্বশুর গণেশবাবু বহু অর্থব্যয় করিয়াও মণীন্দ্রের মুক্তির ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। সুশীলাসুন্দরী হতাশ হইয়া শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে তাঁহার জীবনের আশা কমিয়া আসিল।

গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করা হইল, মণীন্দ্রের মাতা একপ্রকার মৃত্যুশয্যায়; অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য মণীন্দ্রকে ছাড়িয়া দেওয়া হউক্; মাতা পুত্রের সহিত শেষ সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।

কাগজে ইহা লইয়া খুব আন্দোলন চলিল।

কিছুদিন অনুসন্ধান ও বিবেচনার পর পত্র আসিল, মণীন্দ্র এখন অত্যন্ত অসুস্থ ও দুর্ব্বল—এতদূর পথ তাঁহার এ শরীরে যাওয়া অসম্ভব। মণীন্দ্রের মাতার অসুখের জন্য গভর্ণমেণ্ট অত্যন্ত দুঃখিত এবং আশা করেন তিনি শীঘ্র রোগমুক্ত হইবেন। মণীন্দ্র একটু সুস্থ হইলে তাঁহাকে মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে। মণীন্দ্র তখন এ জেল হইতে ও জেলে স্থানান্তরিত হইয়া অবশেষে বর্ম্মার জেলে আসিয়া সত্যসত্যই অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। মণীন্দ্র যে এতদূরে গিয়া পড়িয়াছে, সে কথা সুশীলাসুন্দরীর কাছে গোপন রাখা হইয়াছিল।

চিকিৎসা বা শুশ্রুষার কোন ত্রুটি হইল না। শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণ দেখিলেন, পুত্র কন্যা পুত্রবধূরা প্রাণপণে শুশ্রুষা করিতেছেন; কিন্তু রোগ একটুও কমিল না। জীবনের আশা যখন একপ্রকার রহিল না, মণীন্দ্রকে

দেখিবার ইচ্ছা ও আশা তাঁহার প্রবল হইয়া উঠিল। প্রতিদিন প্রভাতে সুশীলাসুন্দরী আশা করিয়া থাকেন, আজ হয়ত মণী ফিরিবে। বাহিরে পদশব্দ শুনিলে তিনি চমকিয়া উঠেন, এক একবার তাড়াতাড়ি উঠিতে যান্। কাছে যে থাকে সে তাঁহাকে ধরিয়া বলে মা, উঠবেন না, কেউ নয়। তিনি ক্লান্ত হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করেন; মুদ্রিত চক্ষুর মধ্য দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়ে।

একদিন প্রভাতে সুশীলাসুন্দরী নিজেকে যেন অনেকখানি সুস্থ মনে করিলেন। তাঁহার কৃশ পাণ্ডুর মুখে সত্যসত্যই এক প্রকার উজ্জ্বলতা ফুটিয়া উঠিল।

ফণী ও সুরেশবাবু—সবে মাত্র হাত মুখ ধুইতে গিয়াছেন। ইন্দু ও কমলা উঠিয়া বাহিরে গিয়াছে। উষা সাবধানে সুশীলাসুন্দরীর হাত মুখ ধুয়াইয়া দিয়া বলিল—মা এবার ওষুধটা দিই?

অতি প্রসন্ন নেত্রে পুত্রবধূর পানে চাহিয়া সুশীলাসুন্দরী বলিলেন—বৌমা মা-রাজরাজেশ্বরী হও মা!

উষার চোখের কোলে কোলে জল ভরিয়া আসিল। উষা বলিল—কেন মা, আজ এমন করে কথা বল্‌ছেন?

আজকাল কথা কহিতে গেলেই সুশীলাসুন্দরীর চোখে জল আসিয়া পড়ে। তিনি বলিলেন—"তোমায় আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, মা। আমার বড় সেবা করেছ তুমি। ছেলেমেয়েতেও অত করতে পারে না।"

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চোখের কোণ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। উষা চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল—"আমি কি আপনার মেয়ে নই মা?"

সুশীলাসুন্দরী উষার গায়ে স্নেহভরে হাত রাখিয়া বলিলেন—"তুমি আমার ছেলের চেয়ে বড়, মেয়ের চেয়ে বেশী।"

উষা আবার পুরাতন কথা পাড়িল—এবার ওষুধটা দিই মা?

সুশীলাসুন্দরী ধীরে ধীরে বলিলেন—বৌমা, আজ আর ওষুধ খাবনা। আমি আজ সব দেখ্‌তে পাচ্ছি—সব বুঝ্‌তে পাচ্ছি।

উষা ভয় পাইয়া বলিল,—ও রকম করে বলবেন্ না মা, আপনার পায়ে পড়ি।

সুশীলাসুন্দরী বলিলেন, ভয় কি মা! তুমি বড় বৌ, তোমাকে যে সব তাতে স্থির থাক্‌তে হবে। আমি মা তোমাদের সংসারের ছেলেবেলাতেই বড় বৌ হয়ে এসেছিলাম; কারও উপর রাগ পর্য্যন্ত করবার যো ছিলনা।

উষা কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—আমিও তো রাগ করিনা মা।

সুশীলাসুন্দরী বলিলেন—তা আমি জানি মা! এখন শোন বৌমা, সবার অসাক্ষাতে তোমাকে একটা কথা বলে যাই।

উষা মাথা নীচু করিয়া বলিল—কি মা সুশীলাসুন্দরী গলার স্বর আর একটু নীচু করিয়া বলিলেন, ইন্দুর ভার তোমার ওপর দিয়ে গেলাম মা। ওকে তুমি দেখো। ইন্দু যদি বিয়ে করতে না চায়, ওর অমতে ওর বিয়ে দিতে দিওনা। এর কারণও তোমাকে বলে যাচ্ছি মা। অভাগী মণীকে মনে মনে ভালবাসে। যখন আমি একথা জান্‌তে পারলাম, তখন আমি ছোট বৌমাকে পেয়েছি। তা নইলে আমি ওর জীবন কি এমনি করে ব্যর্থ হতে দিই? তোমায় আমি এ গোপন কথাটি বলে গেলাম মা,—এ কথা তুমিও গোপন রেখ। ফণী এ কথা জানে না, যদি ইন্দুর বিবাহ দিতে ফণী পীড়াপীড়ি করে তা হলে কেবল তাকে বোলো, ইন্দু মণীকে অনেকদিন থেকে মনে মনে ভালবাসে; ও আর কাউকে বিবাহ কর্‌তে পার্‌বে না। তাই আমি বারণ করে গেছি। ছোট বৌমা যেন না জান্‌তে পারেন। মায়ের যে কোমল মন বড় ব্যথা পাবেন তা হলে। বাছা আমার কেঁদে সারা হবে।

কমলা বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে যাইবে এমন সময় এই কথা কয়টি তাহার কাণে গেল—অভাগী মণীকে ভালবাসে।

কে সে অভাগী? কমলার আর পা উঠিল না। বাকি কথা কয়টা সে অনিচ্ছাতেও শুনিয়া ফেলিল। ইহা শুনিয়া তাহার মুখ চোখের অবস্থা যে রকম হইল, যে সে মুখ চোখ লইয়া কমলা গৃহমধ্যে আসিতে সাহস করিল না। পায়ে পায়ে আপনার কক্ষে ফিরিয়া আসিল।

ক্রমশঃ একে একে সবাই সুশীলাসুন্দরীর ঘরে ফিরিলেন। সুশীলা-সুন্দরীকে অন্যদিনের চেয়ে একটু সুস্থ দেখিয়া সকলে প্রফুল্ল হইলেন।

ফণীন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—মা আজ একটু ভাল মনে কচ্ছেন?

সুশীলাসুন্দরী একটু ম্লান হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ বাবা।

ঊষা বলিল, মা আজ ওষুধ খান্ নি। ফণী মায়ের পানে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, কেন মা?

সুশীলাসুন্দরী সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, তার জন্য দুঃখ পেওনা বাবা। আর আমার ওষুধের দরকার নেই।

সুরেশবাবু শিয়রের কাছে বসিয়াছিলেন। আর একটু সরিয়া আসিয়া বলিলেন, এ কথা কেন বলছ তুমি?

কথা কয়টি এমন গভীর স্নেহ ও বেদনার সহিত উচ্চারিত হইয়াছিল, যে তাহা শুনিবামাত্র সুশীলাসুন্দরীর দুই চক্ষু বাষ্পাকুল হইল। স্বামীর পানে মধুর দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি বলিলেন, দেখ, আজ আমি অনেক কথাই বুঝতে পাচ্ছি। আমি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি যে তোমার কাছে বেশীক্ষণ আর আমি থাকতে পাবনা। মণীকে এখানে দেখা আমার অদৃষ্টে আর নেই। তবু যেন মনে হয়,—কাল রাতে আমি তাকে দেখেছি। ফণী যখন কাল রাতে ঐ সবুজ আলোটা কমিয়ে আমার চোখের আড়াল করে রেখে গেল, আমি তখন

চোখ বুঁজে মণীর মুখখানি ভাবছিলাম। খানিক পরে কে যেন বল্লে, আয় আমার সঙ্গে, মণীকে দেখ্‌বি। আমার শরীরের সকল গ্লানি তখন কেটে শরীর এমন হাল্‌কা হয়েছে যে, আমার রোগের যেন চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। আমি যেন তাঁর ইচ্ছামত বাতাসে ভেসে যেতে লাগলাম। উপরে নীল আকাশ, সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে, নীচে নীল সমুদ্র কোথায় ছুটে চলেছে। সে সমুদ্র শেষ হয়ে এল, তবু আমার চলার শেষ হ'ল না। আরও অনেক দূর গিয়ে এক প্রকাণ্ড জেলখানার সাম্‌নে গিয়ে আমাকে নাম্‌তে হ'ল। আমরা আস্‌তেই লোহার প্রকাণ্ড দরজা খুলে গেল। ভিতরে গেলাম। দেখলাম একটা ঘরের মধ্যে খাটের উপর আমার মণী শুয়ে আছে। অত রাত্রেও একজন ডাক্তার তার নাড়ী দেখ্‌ছে; আর একজন তার মুখের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরে দু'জনে কি পরামর্শ করে মণীকে ইন্‌জেক্‌শান দিলে, মণী চোখ মেলে চাইলে। আমাকে দেখে তার ম্লান মুখখানি হাসিতে ভরে উঠ্‌ল। বল্লে, মা তুমি এসেছ, এবার আমি শীগ্‌গির ভাল হয়ে উঠ্‌ব।

তারপর সব যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

সুশীলাসুন্দরী এতগুলি কথা একসঙ্গে কহিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

সকলেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। কমলা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল!

সুশীলাসুন্দরী কমলাকে কাছে ডাকিলেন, কমলা কাছে আসিলে তাহার চক্ষু মুছাইয়া চিবুকে হাত দিয়া বলিলেন—লক্ষ্মী, মা আমার, কেঁদোনা। আমি তোমায় নিশ্চয় করে বলে যাচ্ছি, মণী ফিরে আস্‌বে।

ফণীর পানে ফিরিয়া বলিলেন—বাবা ফণী, মণী ফিরে এসে আমায় না

দেখে যেন চোখের জল না ফেলে। তাকে বোলো তার জন্য আমি আমার বুকভরা আশীর্ব্বাদ রেখে যাচ্ছি—তার সাধনা যেন সফল হয়।

তারপর স্বামীর পানে চাহিয়া বলিলেন, এবার বড় ঘুম আস্‌ছে, একটু ঘুমুই ?

সুরেশবাবু বলিলেন, হ্যাঁ ঘুমোও, আমি তোমার কপালে হাত বুলিয়ে দিই।

সুশীলাসুন্দরী অত্যন্ত আরামের সহিত কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া রহিলেন।

একটু পরে চক্ষু মেলিয়া স্বামীর পা দুখানি হাত দিয়া মুছাইয়া আপনার মাথায় রাখিলেন। একবার মধুর হাসিয়া স্বামীর পানে চাহিয়া বলিলেন, আমি তাহলে আগে যাই—তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকিগে।

তারপর চক্ষু মুদিয়া ধীরে ধীরে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। সে নিদ্রা এখানে আর ভাঙ্গিল না।

ইহার পরদিনই গৌরাঙ্গ তাঁহার সমস্ত সঞ্চিত সম্পত্তি দেশের ভাণ্ডারে অর্পণ করিলেন ও তাঁহার প্রচুর অর্থপ্রসূ ব্যারিষ্টারি বৃত্তি ত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক মহাত্মা প্রদর্শিত অসহযোগব্রত গ্রহণ করিলেন।

মণীন্দ্রের সঙ্গে মায়ের দেখা হইল না। এদিকে কমলা পীড়িত হইয়া পড়িল। মণীন্দ্রকে লইয়া যাওয়ার পর হইতে কমলা আপনার শরীরের কোন যত্ন করিত না। সুশীলাসুন্দরী যতদিন ছিলেন, একপ্রকার জোর করিয়াই তাহাকে সময়মত স্নান করাইতেন খাওয়াইতেন। কিন্তু দুঃখ দিনের পর দিন মনের মধ্যে কঠিন পাষাণের স্তূপ হইয়া জমিতেছিল। সে দুঃখ কমাইবার বা রোধ করিবার তিনিও কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেন না।

সুশীলাসুন্দরীর মৃত্যুর পর কমলা আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার পিতামাতা লইতে আসিলেন। কমলা অশ্রুজলে ভাসিয়া তাহাদের বুঝাইল, এসময়ে শ্বশুরকে ছাড়িয়া যাওয়া তাহার উচিত নহে। কন্যার কঙ্কালসার মূর্ত্তি দেখিয়া মায়ের হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছিল; তথাপি কন্যার মুখ চাহিয়া তিনি দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন এখানে থাকিলে কমলা তবু কিছু শান্তি পাইবে। এ দুঃখের মধ্যেও সে যদি একটু শান্তি পায় সেই ভাল। দুজনেই প্রতিদিন একবার করিয়া দেখিতে আসিতেন।

বর্ষা আসিল। কমলার অসুখ আরও বাড়িল। রোগ ক্রমে থাইসিসে পরিণত হইল। ক্রমশঃ কমলা শয্যাগত হইয়া পড়িল। ডাক্তারের মতে জীবনের আর আশা রহিল না।

ফণীন্দ্র এবার মণীর মুক্তির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করিল। ইংরাজী বাংলা সংবাদ পত্রে লিখিয়া পাঠাইল— মাত্র সন্দেহে রাজবন্দী মণীন্দ্রের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ। মা যখন মৃত্যু-

শয্যায় তখনও আবেদন করা হইয়াছিল, কোন ফল হয় নাই। এবার মণীন্দ্রের স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়, এবারও যদি আবেদন বিফল হয় তাহা হইলে স্ত্রীর সঙ্গেও তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ হইবে না।

এই সময়ে ইন্দু সমস্ত কাজ ফেলিয়া দিবারাত্রি কমলার কাছে থাকিত। তাহার সমস্ত শুশ্রূষার ভার সে আপনি গ্রহণ করিল। কমলার পুত্রের ভার লইল ঊষা।

ইন্দুর মুখের পানে কমলা অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, আর অনেক কথা ভাবে। একদিন ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ভাই, তুমি আমার মুখের পানে মাঝে মাঝে চেয়ে থাক কেন?

কমলা। তোমায় দেখি।

ইন্দু। কেন, আমি কি তোমার কাছে নূতন?

কমলা। নূতন নও; কিন্তু তবু তোমায় দেখি আর ভাবি তুমি এত করে আমার সেবা কর কেন?

ইন্দু। তোমাব সেবা করা বেশী কথা হ'ল কি? আমার যদি অসুখ হ'ত তুমি কি করতে না?

কমলা। করতে চাইতাম—কিন্তু এর অর্দ্ধেকও বোধ হয় করতে পারতাম না। অন্য কেউ হলে আমার উপর কত রাগ করত।

ইন্দু। রাগ করত! কেন?

কমলা। তোমার যা কিছু আমি এতদিন ধরে ভোগ-দখল করে আসছি, তাই।

ইন্দু। তুমি আমার কিচ্ছু ভোগ দখল করনি ভাই। তাছাড়া তুমি তো জানতে যে এ বিষয় আমার, আর আমিও জানতাম না যে আমার কোন বিষয় আছে। তখন আর তোমার দোষ কি? কিন্তু এতদিন পরে সে সব কথা কেন ভাই? এখন মন চঞ্চল কোরোনা ভাই,

শীগ্‌গির সেরে ওঠো লক্ষ্মী ভাই। মণীদা আসুন, তাঁর কাছে তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে তবে আমি নিশ্চিন্ত হব।

কমলা। কেন ভাই? তিনি কি তোমায় কিছু ব'লে গেছেন?

ইন্দু। হ্যাঁ, তিনি তোমার ভার আমার উপর দিয়ে গেছেন।

কমলা শুনিয়া সুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

ইন্দু। অমন করে নিঃশ্বাস ফেল্‌লে কেন ভাই?

কমলা। তুমি বুঝি তাই আমায় এত যত্ন কর? নইলে করতে না।

ইন্দু। নইলেও করতাম—তবে এত উদ্বেগ থাক্‌ত না।

কমলা। কিসের উদ্বেগ?

ইন্দু। তোমার এই রুগ্ন শরীর দেখে তিনি কি ভাব্‌বেন!

কমলা। আর বুঝি ভাব আমি যদি মরে যাই, তিনি এলে কি বল্‌বেন—নয়?

ইন্দু। তুমি যদি এমনি পাগলামি কর, আমি ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে থাক্‌ব—খাবনা দাবনা, কিছু না।

কমলা। না ভাই আর বলব না—তুমি রাগ করবে না তো?

ইন্দু। না।

ইন্দু কমলার কপালে মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। কমলা কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল। আবার একটু পরে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

সুরেশবাবু ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কেমন আছ মা?

কমলা। বোধ হয় ভাল আছি বাবা।

সুরেশবাবু কমলার কপালে হাত দিয়া উত্তাপ পরীক্ষা করিলেন। বলিলেন—'জ্বর একটু কম বোধ হচ্ছে আজ নয় মা ইন্দু?'

ইন্দু তৎক্ষণাৎ বলিল—হ্যাঁ আজ একটু কমই।

সুরেশবাবু। আজ একটা সুখবর আছে মা।

ইন্দু। কি খবর জ্যাঠামশায় ?

দুজনেরই বুক আশা ও আশঙ্কায় দুরু দুরু করিতে লাগিল।

সুরেশবাবু। এতদিন পরে ভগবান্ মুখ তুলে চেয়েছেন। মণী মুক্তি পেয়েছে। কাল সন্ধ্যায় জাহাজে এসে পৌঁছুবে। তোমরা কেউ বিচলিত হোয়ো না মা। সে এসে যেন তোমাদের কাউকে কাতর না দেখে।

তারপর সুরেশবাবু ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

সুরেশবাবু উঠিয়া যাইতেই কমলা ইন্দুর মুখের পানে চাহিয়া অশ্রুজলে ভাসিয়া ডাকিল—ভাই !

ইন্দুরও চক্ষু ছাপিয়া অশ্রু ছুটিল। সেও কোনমতে বলিল, কি ভাই !

তারপর দুজনের অশ্রুপ্রবাহ দুজনকে শান্ত করিল। কিছুক্ষণপরে কমলা কথা কহিল—ভাই !

ইন্দু। কি ভাই !

কমলা। আমি কি দেখ্‌তে বড্ড বিশ্রী হয়ে গেছি ?

ইন্দু। কেন, বিশ্রী হবে কেন ?

কমলা। এই রোগে ভুগে ভুগে।

ইন্দু। না ভাই, ও মুখ কখন বিশ্রী হয় ? কেবল রোগা হয়ে গেছ।

কমলা। যদি আমাকে দেখে তিনি রাগ করেন ?

ইন্দু। রাগ করবেন না। তোমায় আরও বেশী করে ভালবাসবেন। ভালবাসার জন কষ্ট পেলে ভালবাসা আরও বেশী হয়।

কমলা। তিনি এসে আমায় কি বল্‌বেন আমি তাই ভাবছি।

ইন্দু। বল্‌বেন, আমার সোণার কমল এত রোগা হয়ে গেছে। আর এই মুখখানি তুলে ধরে—

বলিয়া ইন্দু চুম্বন করিবার ভঙ্গী করিল।

কমলা আনন্দে চক্ষু মুদিয়া রহিল। তাহার সর্ব্বদেহ ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল।

৪৪

সন্ধ্যায় মণীন্দ্রকে সগৌরবে ষ্টেশন হইতে আনিবার সব ব্যবস্থা ঠিক হইয়াছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে সকাল ৬টায় মণীন্দ্রের ষ্টীমার ঘাটে আসিয়া লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের দুইজন উচ্চ কর্ম্মচারী একখানি ট্যাক্সি করিয়া মণীন্দ্রকে বাসায় পৌঁছাইতে আসিল। রোগীর চেয়ারে বসাইয়া মণীন্দ্রকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল।

সংবাদ পাইবামাত্র আত্মীয় বন্ধু সকলে ছুটিয়া আসিলেন। সেই মণীন্দ্রের শরীরের এই অবস্থা! যে দেখিল, তাহারি চোখে জল আসিল।

আত্মীয় বন্ধু সব চলিয়া গেলে মণীন্দ্র বলিল, আমাকে আগে মাতার ঘরে একবার নিয়ে চল, দাদা।

ভৃত্যেরা চেয়ার উঠাইতে আসিলে মণীন্দ্র দাদার পানে চাহিয়া বলিল—আমি তোমার কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে যাই।

ফণীন্দ্র মণীকে ধরিয়া তুলিল। মণী ফণীন্দ্রের কাঁধে ভর দিয়া দাঁড়াইতে ফণীন্দ্র বাঁ হাত দিয়া ভ্রাতার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিল। দুই ভাই তখন ধীরে ধীরে মায়ের কক্ষে প্রবেশ করিল।

দেওয়ালের গায়ে মায়ের চিত্রখানি তখনো টাঙ্গানো। মা এখনো

যেন হাসিমুখে চাহিয়া আছেন। দুইবৎসর পরে মণীন্দ্র মুক্তি পাইয়াছে। একবৎসর অটমাস পুত্রের পথপানে চাহিয়া চাহিয়া মাতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। মায়ের শত চিন্তা, সহস্র বেদনা, অগণিত দীর্ঘশ্বাস, প্রতিদিনের সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা যেন মূর্ত্তি ধরিয়া মণীন্দ্রের চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। কক্ষতলে বসিয়া পড়িয়া মেঝের উপর মাথা লুটাইয়া মণী যুক্ত-করে বহুক্ষণ ধরিয়া মায়ের চরণোদ্দেশে প্রণাম করিল। পরে মাথা তুলিয়া সজল নয়নে বলিল, দাদা মা আমার কথা কি বলে গেছেন ?

ফণীন্দ্র সাশ্রুনয়নে কহিল, মা যতদিন রোগশয্যায় ছিলেন ততদিন তাঁর মুখে তোমার কথা ছাড়া অন্য কথা বড় একটা ছিল না। মৃত্যুর দিনে খালি তোমার কথাই করে গেছেন। বলে গিয়েছেন, মণী ফিরে আস্‌বেই। আমার অদৃষ্টে নেই তাই দেখা হ'ল না। সে এলে তোরা বলিস্‌, আমি বুক ভরে তার জন্য আশীর্ব্বাদ রেখে যাচ্ছি। সে যে পথ বেছে নিয়েছে সেই পথেই মণী যেন সিদ্ধিলাভ করে।

তরপর চক্ষু মুছিয়া ফণী আবার বলিল—আমাদের মত মা ক'জনের হয় ভাই। পূর্ব্বজন্মের অনেক পুণ্য ছিল, তাই এমন মায়ের গর্ভে জন্মেছিলাম।

এমন সময় সুরেশবাবু ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দুজনেরই চক্ষে বিগলিত অশ্রুধারা দেখিয়া তাঁহার সৌম্যশান্ত মুখে বেদনা ফুটিয়া উঠিল।

মণীন্দ্র পিতার পানে চাহিয়া বলিল, বাবা আজ যদি এসে মাকে দেখ্‌তে পেতাম, তাহলে আমার এই দুবছ'রের জেলের কষ্টের জন্য কোন ক্ষোভ থাকৃত না।

সুরেশবাবু বলিলেন—তোমরা চোখের জল ফেলে তাঁর আত্মাকে ব্যথিত কোরো না। সর্ব্বক্ষণ অনুভব কোরো—চিরদিন মনে রেখো

তাঁর নির্ম্মল নিষ্পাপ আত্মা তোমাদের মঙ্গল চিন্তায় সর্ব্বক্ষণ তোমাদের পাশে আছেন। এমন পবিত্র আত্মা তোমাদের মায়ের ছিল, যে তাঁর ইচ্ছাতেই কার্য্য হ'ত।

মৃত্যুর দিনে তিনি বল্লেন, কাল রাত্রে আমি মণীকে দেখেছি। অকাশের নীচে ভাস্তে ভাস্তে যাচ্ছি, নীচে সমুদ্র, ডাক্তারেরা তোমাকে ইন্‌জেক্‌শান দিচ্ছেন, তুমি বড়ই রোগা হয়ে গিয়েছ। এমন ভাবে এ সব কথা তিনি বল্লেন, যেন এইমাত্র প্রত্যক্ষ করে এলেন। অথচ তাঁকে আমরা বলিনি যে তোমাকে বর্ম্মার জেলে রাখা হয়েছে।

মণীন্দ্র বলিল, বাবা, আমিও সে রাত্রে মাকে ঠিক দেখেছি। যেন মনে হ'ল মা আমার শয্যার সুমুখে এসে দাঁড়াইলেন। আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বল্লেন, ভয় নেই বাবা শীগ্‌গির সেরে যাবি, আবার বাড়ী ফিরে যাবি। মায়ের সে কথা আর সে দৃষ্টি আমি জীবনে কখন ভুলবনা।

সুরেশ বাবু বলিলেন,—এবার মণি, তুমি আমার ছোটমার কাছে একবার যাও। তোমাকে দেখে তিনি যদি সেরে ওঠেন, তবু আমার অনেকটা সান্ত্বনা থাকবে।

ইন্দু কমলাকে এই সময়টায় ইচ্ছা করিয়াই একা রাখিয়াছিল। মণীন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া দেখিল শীর্ণা কমলা দুয়ারের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে।

মণীন্দ্র ধীরে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া কমলার একখানি শীর্ণ হাত আপনার হাতের মধ্যে রাখিল। কমলা মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখের পানে সজল নয়নে চাহিয়া রহিল। তাহার দুই বৎসরকার সঞ্চিত সকল বাণী অশ্রুসাগরের মধ্যে কোথায় হারাইয়া গেল!

মণীন্দ্র আসিতে কমলার অবস্থা একটু ভাল হইতে লাগিল। হঠাৎ একদিন যে টুকু উন্নতি হইয়াছিল তাহা অন্তর্হিত হইয়া কমলার অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। যে কোন মুহূর্ত্তে সকলে তাহার মৃত্যু প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

মণীন্দ্র পূর্ব্বাপেক্ষা—সুস্থ হইয়াছে ও বল পাইয়াছে। সে দিন কমলা স্বামীকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিল—তুমি যখন আসনি, তখন কেবলই আমি ভগবানের কাছে মান্‌তাম—তাঁকে এনে দাও, ঠাকুর! তাঁকে একটি বার দেখে আমি যেন মরি।

কিন্তু তোমাকে দেখে তোমাকে ছেড়ে আর মর্‌তে ইচ্ছা করছে না।

মণীন্দ্র কমলার কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, তুমি বাঁচবেনা কে বল্‌লে কমলা?

কমলা। আমি যে নিজে বুঝ্‌তে পাচ্ছি—তোমার চোখের পানে চেয়ে জান্‌তে পাচ্ছি।

মণীন্দ্র। শক্ত রোগ কি মানুষের হয় না—তুমি ও রকম কথা বোলোনা।

কমলা। কেন আমাকে ভোলাচ্ছ? তার চেয়ে আমার যা বল্‌বার আছে তাই বল্‌তে আমাকে অনুমতি দাও; তুমি বলোনা বল্‌লে আমি তো বল্‌তে পার্‌ব না।

মণীন্দ্র। তোমার কি কথা বল্‌বার আছে—বল।

কমলা। আমার একটা কথা রাখ্‌বে?

মণীন্দ্র। কি কথা বল।

কমলা। তুমি আগে বল রাখ্‌বে। এই আমার শেষ কথা; জীবনে আর কখন তোমার কাছে কিছু চাইব না—এই আমার শেষ চাওয়া—বল রাখবে ?

মণীন্দ্র। তুমি কেঁদনা—কি কথা বল, রাখ্‌বো

কমলা। খোকা ধনকে আর তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার প্রাণ চাইছে না। কিন্তু যেতেই হবে। তোমাদের দু'জনকে আমি আর একজনের হাতে সঁপে দিয়ে যেতে চাই। তাকে তুমি আমার জায়গায় গ্রহণ করে খোকার মায়ের অধিকার তাকে দিও। —তুমি অমন করে চেয়োনা, মুখ ফিরিওনা। তুমি জাননা, ইন্দু দিদি তোমাকে কত ভাল বাসে। তোমাকে সে ভালবাসে তাই সে আর কাউকে বিবাহ কর্‌তে চায়নি, আর কর্‌বেও না। আমার একথা তুমি অবিশ্বাস কোরোনা। আমি মায়ের মুখ থেকে একথা শুনেছি। আমার কথাটা আগে আমাকে শেষ কর্‌তে দাও—তারপরে তুমি যা হয় বোলো। ইন্দু দিদি আমা হতে সব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তার অগাধ ঐশ্বর্য্য—আমি তার এতদিন উত্তরাধিকারিণী ছিলাম। তোমায় সে অনেক দিন থেকে ভালবাসে আমি এসে কেড়ে নিলাম। তারপর এমনি তার অদৃষ্ট, তুমি আবার তারই হাতে আমার ভার দিয়ে গেলে! কিন্তু এততেও সে আমার উপর একদিনও এতটুকু বিরক্ত হয়নি। আমাকে সে যে কি যত্ন করেছে, তা তুমি সবারই মুখে শুনেছ। কিন্তু আমার কাছেও তুমি একবার শোন। ইন্দু দিদি মা মারা যাবার পর থেকে মাস চারেক সত্যিকারের রাত্রে ঘুমায় নি। আমার রোগ এমন যে, রাত্রে কিছুতেই ঘুম আস্‌ত না। ইন্দু দিদিও আমার সঙ্গে জাগ্‌ত।

কমলা—এক সঙ্গে এতগুলি কথা বলায় শ্রান্ত হইয়া চুপ করিল। মণীন্দ্র নির্ব্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিল। ইন্দুর চোখের চাহনি, তাহার

হাতের অযাচিত সুনিপুণ সেবা, তাহার অভীপ্সিত সমস্ত কার্য্যে ইন্দুর অসীম অনুরাগ—সর্ব্বোপরি তাহার কারাবাস যাত্রার দিন তাহার পায়ের উপর ইন্দুর সেই সজল চুম্বন যাহা সে সেদিন ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে নাই ও তাহার অর্থও খুঁজিয়া পায় নাই—সে সমস্ত একে একে তাহার মনে উদিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, কমলার কথা। কি উদার, পবিত্র, স্বার্থলেশ শূন্য হৃদয় লইয়া কমলা পৃথিবীতে আসিয়াছিল।

মণীন্দ্রের চোখে জল আসিল।

কমলা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, তুমি বুঝি কাঁদছ—আমার কথায় উত্তর দিলেনা? তুমি কেঁদোনা, চুপ কর—আমার কথায় রাজী হও, আমার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ কর। নইলে আমার কি হবে! আমি কি করে শান্তিতে মরব।

মণীন্দ্র অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে বলিল, আমায় কেন এমন শাস্তি দিচ্ছ কমলা? আমি তোমার কি দোষ করেছি?

না গো তুমি কোন দোষ করনি, তুমি দোষ করতে পারনা;—তুমি আমায় দয়া কর, আমায় শান্তিতে মরতে দাও।

বলিয়া কমলা শয্যা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিয়া মণীন্দ্রের পায়ের উপর মাথা লুটাইল।

কমলার আর্ত্তব্যাকুলতা মণীন্দ্রকে অতিশয় কাতর করিয়া তুলিল। সযত্নে কমলার মাথা বালিশের উপর তুলিয়া দিয়া অতি কষ্টে সে বলিল—তুমি যাতে শান্তি পাও, তাই হবে।

কমলা পরম অনুরাগ ভরে স্বামীর ডান হাত খানি দুই হাত দিয়া ধরিয়া আপনার বুকের উপর রাখিয়া কিছুক্ষণের জন্য চক্ষু মুদিল। তাহার মুদিত চক্ষুর দুই প্রান্ত দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

অপরাহ্নে কমলার শরীর কেমন যেন অবসন্ন হইয়া আসিল। ডাক্তার আসিয়া নাড়ী দেখিয়া বাহিরে আসিয়া সুরেশবাবুকে বলিলেন, আজই শেষ রাত্রি।

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। সুরেশবাবু আবার কমলার ঘরে প্রবেশ করিয়া কমলার শিয়রে বসিলেন। ইন্দু ও উষা তখন কাছে বসিয়াছিল। সুরেশবাবু বলিলেন, তোমরা একটু বরং ঘুরে এস। আমি একটু মায়ের কাছে বসি।

ইন্দু ও উষা কিছুক্ষণের জন্য উঠিয়া গেল।

সুরেশবাবু কিছুক্ষণ কমলার ক্ষীণ পাণ্ডুর মুদিত নেত্র মুখমণ্ডলের পানে চাহিয়া থাকিয়া ডাকিলেন—কেমন আছ মা?

কমলা চমকিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিল। শ্বশুরকে দেখিয়া একবার ডাকিল—'বাবা'! পরক্ষণে আবার চক্ষু মুদিল।

সুরেশবাবু কমলার ললাটে হাত দিয়া বলিলেন,—কেন মা? কি বলছ?

কমলা আবার চক্ষু মেলিল। আবার ডাকিল, 'বাবা'।

সুরেশবাবু ঘুম ভাঙ্গাইবার মত উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, কি কষ্ট হচ্চে মা?

কমলা সুধু কাতর দৃষ্টিতে আর একবার চাহিল।

সুরেশবাবু পুনরায় বলিলেন, অমন করে চাইছ কেন মা? কি বল্‌তে চাও, আমায় বল।

কমলা ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, বাবা, একটা কথা বল্‌তে যাচ্ছি, পাচ্ছিনে।

সুরেশবাবু। তুমি আমার মা! কি বল্‌তে চাইচ বল মা—লজ্জা কি?

কমলা। আমার জন্য ইন্দুদিদি সব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ইন্দু দিদির সব অধিকার আমি আজ তাঁকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমার জায়গায় তাঁকে আপনি গ্রহণ করবেন।

সুরেশবাবু। কেন তুমি একথা বল্‌ছ মা?

কমলা। আজ মা তো নেই—তাই আপনাকেই একথা বলে যাচ্ছি। মা একদিন দিদিকে একটা কথা বল্‌ছিলেন, আমি সেই ঘরে ঢুকতে গিয়ে শুনে ফেলেছিলাম। আমার প্রার্থনা রাখুন বাবা।

সুরেশবাবু। মা, মণী যদি রাজী হয় আমি তোমার কথা রাখ্‌ব। কিন্তু তোমায় আমি কখন ভুল্‌ব না। তোমার আর কি ইচ্ছা বল মা।

কমলা। আগে যেমন সবাই এক ঘরে জমা হ'ত, গান হ'ত। আজ একটিবার তাই দেখ্‌তে আর শুন্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে।

সুরেশবাবু উষাকে ডাকিয়া কাছে বসিতে বলিলেন। ইন্দুকে বলিলেন, মণী ছোট মাকে গান শোনাবে, তুমি তার সব ব্যবস্থা করে দাও মা। তখন সূর্য্যাস্ত আসন্ন হইয়া আসিয়াছে; আলো টুকু নিভিয়া গেলেই সন্ধ্যা নামিবে।

সকলে কমলার ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। গায়কের আসন কমলার ঠিক পাশেই। কমলা একটি স্বদেশী গান শুনিতে চাহিল।

মণীন্দ্র কমলার পানে একবার ব্যথিত—দৃষ্টিতে চাহিয়া গাহিল—

সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মাগো
তোমায় ভালবেসে।
জানিনে তোর ধন রতন
আছে কিনা রাণীর মতন,
সুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায়
তোমার ছায়ায় এসে।

কোন বনেতে জানিনে ফুল
গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন গগনে ওঠেরে চাঁদ
এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
ঐ আলোতে নয়ন রেখে
মুদ্‌ব নয়ন শেষে।

শীর্ণ শরীরেও মণীন্দ্র গানটি বড়ই মধুর গাহিল; কমলা গানের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গেল। তাহার অশ্রুসিক্ত চক্ষু দুটি শিশির সিক্ত পদ্মের শোভা ধারণ করিল। গানের শেষের সঙ্গে সঙ্গে সে একবার স্বামীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। পরক্ষণে মুখখানি বিবর্ণ হইয়া আসিল।

ইন্দু কমলার পাশেই শয্যার উপর বসিয়াছিল। সে কাঁদিয়া উঠিল।

কমলা যতক্ষণ পারিল স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিল, তারপর সে আলোকে সে প্রথম নয়ন মেলিয়াছিল, সেই আলোকেই তাহার নয়ন দু'টি শেষ বার রাখিয়া চিরতরে মুদিত করিল।

পরিশিষ্ট

বৎসর দশেক পরে কলিকাতার বিখ্যাত নারী চিকিৎসাগার কমলাশ্রমের সম্মুখে একখানি গাড়ী আসিয়া থামিল। ভিতর হইতে একজন পুরুষ, বারো বৎসরের একটি সুন্দর ছেলের হাত ধরিয়া একটি মহিলা নামিলেন। তিন জনেরই পরনে মোটা খদ্দরের পরিচ্ছদ। তাঁহারা আশ্রমের উপর উঠিবামাত্র প্রধান কর্ম্মচারী ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। আশ্রমের সুপ্রশস্ত বারান্দার মাঝখানে একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর স্ত্রীমূর্ত্তি—নীচে লেখা—কমলা দেবী। মহিলাটি বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটি ফুলের মালা লইয়া মূর্ত্তির গলদেশে পরাইয়া দিলেন। পুরুষটি মূর্ত্তির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। বালক সেখানে লুটাইয়া মূর্ত্তিকে প্রণাম করিল।

তারপর পুরুষটি অফিসে বসিয়া কর্ম্মচারীর সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। মহিলা ছেলেটির হাত ধরিয়া আশ্রমের ভিতর প্রবেশ করিলেন। কক্ষে কক্ষে ঘুরিয়া রোগিণীদের দেখিলেন, তাহাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার কি অভাব অভিযোগ তাহার সংবাদ সংগ্রহ করিলেন। এক নবাগতা রোগিণী ছোট্ট একটি ছেলে লইয়া আসিয়াছে, তাহার ছেলেটিকে কোলে লইয়া আদর করিলেন।

তারপর মহিলা বাহিরে আসিলেন। পুরুষটি তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে তিনজনে আবার গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

একজন ফরাসী দেশীয় পরিব্রাজক কিছুদূর হইতে এই সব লক্ষ্য

করিতেছিলেন। ইঁহারা চলিয়া গেলে তিনি প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন---এ মহিলাটি কে বলিতে পারেন ?

ইনি এই নারী চিকিৎসাগারের প্রতিষ্ঠাত্রী।

এ মর্ম্মর মূর্ত্তি কার ?

ওঁর স্বামীর প্রথমকার পত্নীর নাম কমলা দেবী ; এঁরই স্মৃতিরক্ষার জন্য এই চিকিৎসাগারের প্রতিষ্ঠা।

সঙ্গের পুরুষটি ওই মহিলাটির স্বামী ?

আজ্ঞে হ্যাঁ

উনি কি করেন ?

উনি একজন বিখ্যাত দেশ সেবক।

ছেলেটি ওই মহিলারই বোধ হয় ?

হ্যাঁ ওঁরই ছেলে বটে—তবে ওঁর গর্ভজাত নয়। যাঁর মর্ম্মর স্মৃতি দেখ্‌ছেন তাঁরই ছেলে ওটি উনি পুত্রনির্ব্বিশেষেই পালন করেছেন।

এঁরা এখন গেলেন কোথায় ?

সুশীলাশ্রমে—সেও ওঁরই প্রতিষ্ঠিত, একটি আদর্শ নারী শিক্ষালয়। ঐ মহিলার শাশুড়ীর স্মৃতি রক্ষার জন্যে সে আশ্রম স্থাপিত।

এ সবে তো বহু অর্থের প্রয়োজন হয়েছে—এত অর্থ মহিলাটি কোথায় পেলেন ?

উনি বাংলা দেশের এবং বিখ্যাত ভূস্বামীর একমাত্র কন্যা। ওঁর সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি এই দেশ হিতকর কাজে ব্যয় করেছেন।

তার পর পরিব্রাজক পুরুষ এ মহিলার নাম ও ঠিকানা আপনার নোট বুকে টুকিয়া লইলেন। যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন,—ধন্যবাদ আমি আজ এই শিক্ষা পাইলাম যে, কোন দেশের নরনারীর সম্বন্ধে যদি কিছু জানিতে হয় তো, সেই দেশে পদব্রজে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তবে তাহা জানা

উচিত। ঘরে বসিয়া স্বল্প জ্ঞান বা দেশগত ঈর্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত যে কোন পুস্তকের লেখায় নির্ভর করা কর্ত্তব্য নহে।

আর একবার প্রসংশমান দৃষ্টিতে কমলাশ্রমের দিকে চাহিয়া পরিব্রাজক ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

বলা বাহুল্য এই তিন জন—মণীন্দ্র, ইন্দু ও তাঁহাদের এক মাত্র পুত্র-কমলার গচ্ছিত ধন—দুঃখ হরণ।

সমাপ্ত

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

অপূর্ণ

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর পিতাপুত্রের মিলন। এ মিলনে চোখে অশ্রু আসে; হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়; মনের মলিনতা দূর হয়। নানা চরিত্র ও ঘটনার বিচিত্র সমাবেশ। গার্হস্থ্য উপন্যাস—দুই টাকা মাত্র।

অশ্রু-নির্ঝর

পানদোষ কি করিয়া সুখের সংসার নষ্ট করে, কি করিয়া দেবতা দানবে পরিণত হয় তাহার নিখুঁত ছবি। সর্ব্বংসহা বসুমতীর অবিচল স্বামী প্রেম, ভ্রাতার গভীর স্নেহ, কৃতজ্ঞতার নির্ম্মল নিদর্শন চলচ্চিত্রের মত একটির পর একটি চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিবে। দুই টাকা মাত্র।

কাল-বৌ

উপন্যাস (২য় সংস্করণ)—আট আনা মাত্র।

প্রশান্ত

শিক্ষাসম্বন্ধীয় একমাত্র উপন্যাস। পিতামাতার শিক্ষা কি করিয়া শিশুগণের মুখের হাসি চিরদিন অম্লান থাকে, কেমন করিয়া তাহাদের আনন্দ বজায় রাখিয়া তাহাদের এই কঠিন সংসারপথের পথিক করা যায়, আবার কি করিয়া সরল, সুন্দর, উৎসাহদীপ্ত পুত্র কন্যা উৎসাহহীন হইয়া পড়ে তাহা দেখিয়া ক্ষোভে দুঃখে চোখে জল আসিবে। দেড় টাকা মাত্র।

পাথরের দাম

গল্পগ্রন্থ—আট আনা মাত্র।